বৈতর্ক

পান্নালাল দাশগুপ্ত

কম্পাস পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড

প্রকাশক:
শম্ভুনাথ ঘোষাল
কম্পাস পাবলিকেশন্স লিঃ
১৪, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ:
আগষ্ট ১৯৬১

মুদ্রাকর:
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস, ৬৬, গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

এই পুস্তকটি কম্পাস কাগজের কয়েকটি নিবন্ধের সংকলন মাত্র। বিভিন্ন উপলক্ষে সভ্যতার সংকট ও আমাদের উন্নয়ন প্রোগ্রামের মডেল ও তার ফলশ্রুতি নিয়ে যে সমস্ত সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ লেখা হয়, সেসবেরই কয়েকটি এতে সংগৃহীত হলো।

উন্নতি বা উন্নয়ন বলতে আমরা কী বুঝি। যদি 'বৃক্ষ ফলেন পরিচীয়তে' এই মাপকাঠি দিয়ে আমাদের উন্নয়ন প্রোগ্রামের মূল্যায়ন করতে চাই, তবে কি আমাদের সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব? উন্নতির উদ্দেশ্য যদি সর্বসাধারণের সুখ বোঝায়, তবে সুখ কাকে বলে, এবং আমরা কি আজ সুখী? ধনীরাই কি সুখী, ধনী পাশ্চাত্য দেশগুলিই কি সুখী, এমনকি তারা তাদের জীবন ও সভ্যতাকে আজ নিরাপদই কি মনে করতে পারছে? পারমাণবিক ইন্টারকন্টিনাণ্টাল মিসাইল ও বোমা নিয়ে কি তাদের সুখের সংসার রক্ষা করার জন্য অতন্দ্র উদ্বেগে পাহারা দিয়ে বেড়াতে হচ্ছে না? বহুবছর আগে বারট্রাণ্ড রাসেল Conquest of happiness বা 'সুখের সন্ধানে' নামে একখানা বই লিখে যান। মানুষ কেন সুখী নয়, এমনকি নিউইয়র্কের মত সমৃদ্ধ সহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যদি লক্ষ্য করো পথিকদের—এবং মোটরবাহিত যাত্রীদের মুখের দিকে, দেখবে তারা কেউ সুখী নয়, হয় বিরক্ত, নয়তো উদ্বিগ্ন, টেনসনগ্রস্ত। অথচ তারা মোটামুটি সবাই অবস্থাপন্ন বা ধনী। তাই তিনি প্রশ্ন করছেন, যদি ধনীরাও এমন অসুখী, তবে সবাইকে ধনী করার মধ্যে কোন উন্নতির প্রোগ্রাম অর্থযুক্ত হয় কি?

সেদিনকার সেই আশাবাদী দুরন্ত অভিযাত্রীর সীমাহীন অভিযানের যুগে, এ জাতীয় প্রশ্নের প্রতি কেউ গ্রাহ্যই করেনি। বিশেষ করে, তরুণেরাতো নয়ই, কেননা তরুণের ধর্ম সুখান্বেষণ নয়, কোন তরুণকে

সুখ কাকে বলে এ জাতীয় প্রশ্ন দিয়ে বিরক্ত করা চলে না। তারা সুখশান্তি চায় না, তারা আরও বড় উত্তেজনা এবং কী যে চায় শেষ পর্যন্ত তাও বুঝতে পারে না। যদি সবাই সত্যি সুখই চাইতো, তবে মোটামুটি-ভাবে একটা সুখ-শান্তি-সোয়াস্তি-পূর্ণ সমাজ তৈরী করা শক্ত নয়। রাসেল বলেছিলেন, "সুখী হওয়ার মূল উপকরণগুলি সরল, এবং এত সরল যে, চতুর বিষয়ী লোকেরা স্বীকার করতেই চায় না তাদের কিসের অভাব।" রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "Happiness should not be costly." আবার রবীন্দ্রনাথই উপনিষদের উক্তি মনে করিয়ে দেন, "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং।" প্রত্যেক মানুষের চরিত্রের মধ্যে নিজের স্বল্পপরিসর সীমাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাবার এক অনির্বাণ তৃষ্ণা। কিন্তু এই তৃষ্ণা কখনই বস্তুবাহুল্য ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সাধনায় মেটানো যায় না। এই ভূমার সন্ধান বিত্ত অর্থ বা বস্তুসংগ্রহের মধ্যে নেই, যিনি বা যা সত্যিই অসীম, তারই সন্ধানে মিলতে পারে, যাকে আনন্দ বলা যায়, সুখ নয়। বস্তু-জগতের সাহায্যেও সেই আনন্দের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, যেমন চন্দ্র উপগ্রহে সশরীরে মানুষের পদপাতটি নিশ্চয়ই সুখের সন্ধানে নয়, তাতে আনন্দ থাকতে পারে। অনেক সময়ই হয়তো দেখা যাবে, এই আনন্দ পেতে হলে অনেক সুখ বিসর্জন করে দুঃখ ও মৃত্যুবরণও করতে হতে পারে। কিন্তু সবার জীবনেই সশরীরে গ্রহনক্ষত্রলোকে বিচরণ করার কোনই সম্ভাবনা নেই। সাধারণ মানুষকে সাধারণ কর্মজীবন ও ঘর-সংসার নিয়েই থাকতে হবে, এমনকি আজকের তরুণ-তরুণীদেরও আগামীকালই সংসার নিয়ে হাবুডুবু খেতে হবে—ব্যর্থ বাসনার আশাভঙ্গের অসন্তোষটি নিয়ে। তাদের কি হবে? একান্ত সাধক, বৈজ্ঞানিক মুষ্টিমেয়ই হতে পারে। রাসেল সাধারণের সুখের কথাই বলেছেন, অসাধারণ প্রতিভা-বানদের জন্য তাঁর অত মাথাব্যথা নয়। রবীন্দ্রনাথ সাধারণের মধ্যেই অসাধারণ, তুচ্ছ ক্ষণিকার মধ্যেও অসীমের স্বাদ পাইয়ে দিতে অনেক গান, অনেক কবিতা, অনেক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। রাসেল ভগবৎবিশ্বাসী চিন্তানায়ক ছিলেন না। রাসেলের দৃষ্টিভংগী ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর বিপরীত বলা চলে। তিনি তন্ময় হতে বলেছেন, মন্ময় নয়। আত্ম-কেন্দ্রিকতা নয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে তৎ-ময় বা তন্ময় হতে বলেছেন। ভারতীয়

দর্শন নিজেকে বোঝো, নিজেকে জানো—এই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে অকারণ আত্মকেন্দ্রিকতার প্রশ্রয় দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মন্ময় ও তন্ময়ের মধ্যে একটা সেতু সৃষ্টি করতে বলেছেন। রাসেল এভাবে একটা সমন্বয় করার চেষ্টা না করলেও, তাঁর যুক্তিজাল খুবই র‍্যাশানেল। রবীন্দ্রনাথকে র‍্যাশানল না বলে মিস্টিক বলা চলে। সীমার সঙ্গে অসীমের সম্পর্ক-স্থাপনটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অবদান, কিন্তু তাঁর বিশ্ববোধটা রাসেলের মত বস্তুবিজ্ঞানভিত্তিক নয়। কিন্তু রাসেলের যুক্তিবাদ কখনো হৃদয়ের স্থান অস্বীকার করে নি।

রাসেল লিখছেন, "ছেলেদের নিয়ে পশুশালায় যাবার যখনই সুযোগ ঘটে, তখনই আপনি, যে-সব বানরেরা ব্যায়ামকৌশল দেখাচ্ছে না, অথবা বাদাম ভাঙছে না, তাদের চোখে দেখতে পাবেন এক অদ্ভুত নিষ্পিষ্ট বেদনা। মনে হয় যেন তারা ভাবছে তাদের মানুষ হয়ে জন্মানো উচিত, শুধু কিভাবে যে তা হতে পারে, তার রহস্য আবিষ্কার করতে পারছে না। বিবর্তনের ধারায় তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে; তাদের জ্ঞাতিরা এগিয়ে গেছে তাদের পিছনে ফেলে। সভ্য মানুষের সত্তাও ঠিক ঐ পশুশালার বানরের মতোই পীড়িত এবং বেদনার্ত। সে বুঝতে পারে তার প্রায় নাগালের মধ্যেই তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছুর অস্তিত্ব আছে, তবু সে জানে না কোথায় তাকে খুঁজবে, কেমন করে তাকে পাবে। হতাশ হয়ে সে তারই মতো দিগ্‌ভ্রান্ত এবং অসুখী মানুষদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিবর্তনের পথে আমরা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছি, যেটি শেষ পর্যায় নয়। একে দ্রুত অতিক্রম করে যেতেই হবে, কারণ না গেলে আমরা অধিকাংশই মধ্যপথে ধ্বংস হয়ে যাব, অবশিষ্টরা সন্দেহ আর ভয়ের অরণ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলবে। অতএব ঈর্ষা-বিদ্বেষ অশুভ হলেও, এবং এর ফল ভয়ংকর হলেও সম্পূর্ণ শয়তানের অধীনে নয়। এটি অংশত একটি বীরত্ব-মূলক বেদনার প্রকাশ; এ বেদনা হয়তো উৎকৃষ্টতর বিরামস্থানের উদ্দেশ্যে অথবা মৃত্যু আর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে চলা নিশাকালীন অন্ধ পথযাত্রীদলের বেদনা। এই হতাশার মধ্যে ঠিক পথটি খুঁজতে হলে সভ্য মানুষ তার হৃদয়কে তেমনি উদার করবে, যেমন সে করেছে তার

মনকে। নিজেকে অতিক্রম করে যাবার কৌশলটি শিখবে, আর সেই সংগে আনবে সমস্ত বিশ্বের মুক্তি।"

ঈশ্বরভক্ত রবীন্দ্রনাথ অথবা গান্ধী হয়তো এখন বেঁচে থাকলে, আর্তস্বরে বলে উঠতেন, God, save us now from ourselves.

মনে হবে, ধান ভানতে এই শিবের গীত কেন? বস্তুত এই সংকলনে যে কয়টি নিবন্ধ আছে সেগুলি মূলতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক। কিন্তু শুধু অর্থনীতি দিয়েই আমাদের সমাজের যাবতীয় কঠিন সংকটগুলি দূর হবে না। টোটাল বা সামগ্রিক চিত্রটি চাই। তাছাড়া অর্থনীতিবিদরা নিজেরাও তা দাবী করেন না। অর্থনীতিবিদরা সাধারণত স্থিতাবস্থারই পরিপোষক, সমাজের কোন বৃহৎ পরিবর্তন বা বিপ্লব কখনই অর্থনীতিবিদদের সাহায্যে ঘটেনি, অর্থনীতিবিদদের নির্দেশমতও রাষ্ট্রপতিরা কমই চলেন। আর রাষ্ট্রনায়করাই বা কী করবেন। তাঁদের অনুগামীদের অর্থাৎ জনসাধারণ—বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জনসাধারণ যা চায় তা যদি রাষ্ট্রপ্রধানেরা না শোনেন, তবে তাদের গদীতে যাওয়া বা থাকা সম্ভবই হয় না। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের চাহিদার ক্ষেত্রেই তুমুল বিচার-বিতর্ক প্রবর্তন করা দরকার। আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের প্রয়োজন এবং আমাদের মধ্যবিত্তদের চাহিদা একধরণের নয়। অথচ মধ্যবিত্তরাই জনসাধারণের সামনে অনবরত সোনালি স্বপ্ন সৃষ্টি করে চলেছে, জনসাধারণ তার দ্বারা সংক্রামিত হচ্ছে।

পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোকই আজ দারিদ্র-সীমার নীচে পড়ে গেছে। অথচ তাদের মাথায় অনবরত এই ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে তারা সবাই উচ্চমধ্যবিত্তের জীবনমান ভোগ করতে পারবে। বাকী যে এক-তৃতীয়াংশ এখন সমৃদ্ধজীবন যাপন করতে পারছে, তা বজায় রাখা—তাদের উন্নতির হার বা গ্রোথ-রেট বজায় রাখতে হলে —পৃথিবীকে শোষণ করতে করতে শেষ করে দিতে হবে, বাকী তিন-চতুর্থাংশের হাড়মাসও চিবিয়ে খেতে হবে। এনার্জি ক্রাইসিস, ধাতুজ সম্পদের অভাব ইত্যাদি এখনই এক বিরাট সংকট সৃষ্টি করেছে—উন্নত ও অনুন্নত সব দেশেরই জন্য। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনবরত growth rate ও লাভের হার বৃদ্ধি না করলে, তাদের গোটা ব্যবস্থাটাই

ভেঙ্গে পড়বে। আজ আমেরিকাকে যদি বলা যায়, তোমরা তো বেশ ভালই আছো, অনেক খাও দাও, গাড়ী বাড়ী করেছো, তোমরা এখানেই সন্তুষ্ট থাকোনা কেন, তোমাদের গ্রোথ-রেটটা না হয় বন্ধই থাকুক। তা তারা শুনতে পারে না, কেননা তারা যদি এই প্রতিযোগিতামূলক ও acquisitive পথ ছেড়ে দেয়, তবে তাদের উপায় কি ? ক্যাপিটেলিষ্ট সিষ্টেম তা করতেই পারে না। একদা রিকার্ডো ও পরে জন ষ্টুয়ার্ট মিল মনে করেছিলেন, বৈষয়িক ক্রমোন্নয়নের গতিবেগকে একদিন একটা সীমা মানতেই হবে, এক জায়গায় গিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে, কেননা পৃথিবীর যা মৌলিক সম্পদ তার একটা সীমা আছে, ক্লাব-অব-রোমের বিচারের বহু পূর্বেই তাঁরাও limits of growth অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখনকার যুগে এই সীমাটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়নি, সংকটরূপেও আজকের মত দেখা দেয়নি। পাদ্রী মালথাস অবশ্য একটা ভয় দেখিয়েছিলেন যে, যে হারে জনসংখ্যা বাড়ে সেই হারে খাদ্য দ্রব্য বাড়তে পারে না—Law of diminishing return সক্রিয় হয়ে মানুষের সীমা অন্ধকারময় করবে। কিন্তু মালথাসের এই কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তৎকালীন টেকনোলজিক উপায় আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে। আজ আবার সেই কথাটাই ঘুরেফিরে আসছে। টেকনোলজি মালথাসের প্রশ্নটি সাময়িক বাতিল করে দেয় বটে, কিন্তু চিরকালের মত সেই উদ্যত খড়গটি উড়িয়ে দিতে পারেনি। মালথাসের আমল থেকে আজকে পৃথিবীতে চার/পাঁচ গুণ লোক বেড়েছে, এবং মানুষের ভোগের ধরণধারণটাও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। টেকনোলজি অনেক দুঃসাধ্য-সাধন করেছে বটে। ফলে টেকনোলজির উপর আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা ভগবানের চেয়েও বেশী হয়ে গিয়েছে! এমন কি টেকনোলজিকেই এখন ভগবান বলে জানি। কিন্তু এখন, এতকাল পরে, টেকনোলজি নিজেই একটা ফ্রাঙ্কেষ্টাইনের মত বিপদজনক হয়ে উঠেছে। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবার জন্য টেকনোলজি ভূগর্ভস্থ সমুদ্রগর্ভস্থ যাবতীয় নন-রিনিউয়েবল সম্পদ উজাড় করে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু ও পরিবেশ দূষিত ও বিষাক্ত করে তুলছে, কেবলমাত্র মানুষের জন্যই নয়, সব জীবজগতের জন্য, গাছপালা-নদী-সমুদ্র-পশুপক্ষী আজ সবই

বিপন্ন। সংযমের কোন ধার ধারে না কেউ, আকাঙ্ক্ষার অনির্বাণ লেলিহান আগুন এদিকে বিশ্বের ছোট বড় সকলের প্রাণে দাউ দাউ করে জ্বলছে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, লোকের ভোগ্যমানের বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, পলিউশানের বৃদ্ধি, চাষযোগ্য ক্ষেত্রের বৃদ্ধি, তার ফলে বন-বনানীর ধ্বংস-বৃদ্ধি, মৌলিক ধাতুজ ও জৈব জ্বালানির অবক্ষয়ের বৃদ্ধি—এই সবগুলি বৃদ্ধি বা growth একত্রেই প্রচণ্ড গতিবেগে ঘটছে, অথচ তারা শেষ পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী। ফলে লিমিটস্ অব গ্রোথ নতুন করে দেখা দিয়েছে, কিন্তু এদিকে ঘরে ঘরে, দেশে দেশে অশান্তি বেড়েই চলেছে, অসন্তোষ বেড়েই চলেছে, যুদ্ধের জন্য সমরায়োজনও বেড়েই চলেছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই ভয় ও ভাবনা আজ পাশ্চাত্য অভিজাত দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও এসেছে।

আমাদের দেশের সমস্যাটা অন্য জাতীয়। অনুন্নত অথচ উন্নয়নকামী দেশগুলির শতকরা ৭০ জন দুবেলা পেট ভরে খেতেও পায় না। এদেশে growth rate zero করো একথার কোন মানেই হয় না। এ বছরে আমাদের শিল্প ও কৃষিতে ৬·৫% গ্রোথ রেট হয়েছে দেখে আমরা খুশি! কিন্তু এই গ্রোথ রেটের সুফলটা কিন্তু ঐ ৭০% দরিদ্র লোকদের ভাগ্যে আসেনি। বড় জোর উপরের ১০% লোকই তার মুনাফাটা নিয়েছে। আমাদের দেশের দারিদ্র দূর করতে হলে বছরে অন্তত ১০/১২% গ্রোথ রেট করা দরকার এবং এও দেখা দরকার যে, সেই গ্রোথ বা উন্নতিটা যাতে নীচের তলার লোকদের জন্যই ঘটে। কিন্তু তা কি হয়, না হচ্ছে? তা যদি হোতো তবে এই বিশ দফা প্রোগ্রাম চালাতে এমার্জেন্সী ঘোষণা করতে হোতো না।

কেন এমনটা হয়? দেশের অর্থনীতিতে গ্রোথ বাড়ে, আবার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্রের গ্রোথটাও বাড়ে কেন? উৎপাদন বাড়লো, কিন্তু উৎপাদিত মাল বিকোবে কোথায়? যাদের হাতে টাকা পয়সা আছে, তারাই হলো ক্রেতা। যাদের কিছু নেই, তাদের জন্য দোকান খুলে লাভ? ব্যাঙ্কের শাখা প্রশাখার বিস্তার বিত্তহীনদের জন্য কী সান্ত্বনা দিতে পারে? রাষ্ট্রের হুকুমে দোকানপাট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ খোলা হয়

বটে, কিন্তু সেগুলি থেকে কাটতি হয় না। ব্যবসাদারেরা (সরকারী-ব্যবসা হলেও তাদের একই অবস্থা হতে বাধ্য) লক্ষ্য করবে কাদের হাতে টাকা আছে। যাদের হাতে আছে, বেশ ভালই আছে। তাদের সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা অত নয়। তারা বিলাস-দ্রব্য বা লাক্সারি গুড্স্ কিনতে আগ্রহী। ফলে এই লাক্সারী গুড্সের বহর দিন দিন বেড়েই চলে। পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলিতেও তাই। এই ভাবে ভোগবাদী সভ্যতার চমকপ্রদ সামগ্রী সৃষ্টিতে কোন সীমা নেই। বিত্তবানদের ভোগবিলাস বৃদ্ধি করার জন্য বিজ্ঞাপনের অভাব নেই। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলি দেখলেই তা অতি সহজে বোঝা যায়। সমস্ত শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাটাই একটা সীমিত বাজার—consumers' enclave কে লক্ষ্য করেই। মূলধন যা সঞ্চিত হয় তার বেশীর ভাগটা নিয়োগ করা হয় এই বিলাস-ব্যসন জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেই, আসল মৌলিক productive কাজে মূলধনের অভাব পড়ে যায়—বিশেষ করে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যে সব বিনিয়োগের প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে গ্রোথ ঘটে না।

পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলি এই consumers' enclaveটা কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছে, শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তদেরও লাক্সারি আইটেম দেবার মত কিছুটা আর্থিক যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়ে, আর—hire-purchase বা ধারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা সৃষ্টি করে—যার ফলে সে দেশের জনসাধারণেরও দেনায় দেনায় মাথা বিক্রি হয়ে আছে। আমাদের দেশেও এই ধরণের ধারে বেচা-কেনার রেওয়াজটা নাকি হু-হু করে বেড়ে চলেছে—বিশেষ করে নতুন শিল্পাঞ্চলগুলিতে। মোটকথা আমরাও পাশ্চাত্যের অনুকরণ বা হনুকরণ করতে আগ্রহী। অথচ আমাদের সত্যিই সেই ক্ষমতা বা ক্রয়ক্ষমতা নেই। কিন্তু হালচালটা পাশ্চাত্য মডেলে চলেছে। তার ফলে বৈদেশিক মুদ্রায় টান পড়ে, দেশে দেশে ঋণ ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়। অর্থনৈতিক পরাধীনতা বাড়তে থাকে—এ প্রায় সব পিছিয়ে পড়া দেশেরই অবস্থা। কয়লা, তেল, অ্যালুমিনা, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি মৌলিক দ্রব্য ও কাঁচামাল সস্তা দরে বাইরে চালান দিতে হয়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একদিকে যেমন লাক্সারি গুড্স্ তৈরী করে নিজেদের উৎপাদনক্ষেত্রে গ্রোথ রেট বজায় রাখার চেষ্টা করছে, অপর দিকে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও তার গবেষণা আরও বৃদ্ধি করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য জোরদার করে রাখছে। এরই জন্য "সব দেশই বিপন্ন", দেশরক্ষার জন্য উদ্বেগটা এরা প্রতি দেশে দেশে জিইয়ে রাখে, ষড়যন্ত্র করে, আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ঘোঁট পাকায়। বিশ্বশান্তির জন্য বা নিরস্ত্রীকরণের জন্য যে সব চেষ্টা হয়, তার প্রায় সবটাই ফাঁকা কথা। বড় বড় রাষ্ট্রেরা হয়তো আর একটা যুদ্ধে যেতে চায় না, কিন্তু ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়ে রাখা অথবা গৃহযুদ্ধ ঘটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করার বাজারটা তারা নষ্ট করতে পারে না।

এই বই'র সংকলিত নিবন্ধগুলিতে যে কথাটি বা প্রতিপাদ্য বিষয়টি ফুটে উঠছে অর্থাৎ আমাদের জীবনমান সহজ ও সরল করার প্রয়োজন, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সকল দিক থেকেই—এ জাতীয় সিদ্ধান্তে অনেকেই হয়তো সহমত হবেন, কিন্তু বিভিন্ন দিক ও উদ্দেশ্য থেকে। যেমন আমেরিকা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ইচ্ছা ছিল, আমরা যেন ভারী শিল্প গড়তে না যাই, কুটির শিল্প, চাষবাস প্রভৃতি প্রাইমারী বস্তুর উৎপাদনে সন্তুষ্ট থাকি! কিন্তু একথার পিছনে যে মতলবটা ছিল সেটা বোঝা দরকার। চাষবাস ইত্যাদি সাধারণ কর্মকাণ্ডের পিছনেও যে ভারী শিল্প ও শিল্পের মদত চাই, নইলে একই জমি থেকে বারোমাস চাষবাস করা, উন্নত ধরণের চাষ করা, অধিক ফসল ফলানো, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ, বিদ্যুৎ, পাম্প ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা করা যায় না, এটা সহজবোধ্য। শিল্প ও ভারীশিল্প দেশ রক্ষার প্রয়োজনেও একান্তভাবে আবশ্যকীয়, এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যও দরকার, একথা অনস্বীকার্য। ষাট কোটি লোকের দেশের বিরাট দারিদ্র দূর করা সহজ কর্মকাণ্ডের ব্যাপার নয়। প্রশ্নটা শিল্প ও ভারীশিল্প নিয়ে নয়, কেবলমাত্র intermediate technology নিয়েও নয়, ভারীশিল্প ও শিল্প কিসের জন্য করা হচ্ছে, দারিদ্র দূর করার জন্য, না ধনীদের সেবার জন্য—সেখানেই হলো আসল বিচার্য বিষয়। সে ভোগ বিলাস মেটানোর প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নামে দেশের যাবতীয় মৌলিক ধাতুজ

পদার্থ ও জৈব জ্বালানি সস্তা মজুরের দ্বারা তুলে নিয়ে বাইরে পাচার করার জন্য ?

এ নিয়ে আর ভূমিকাটা বাড়াবো না। বইয়ের ভিতরের নিবন্ধগুলিতে এসব আলোচনা আছে। এই পুস্তকটার উপলক্ষ্য হলো দেশব্যাপী একটা বিতর্ক সৃষ্টি করা—কোন্ মডেলের সভ্যতা আমাদের চাই—সে সম্বন্ধে একটা সচেতনতা ও বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টি করা। এই বিতর্ক সম্মেলনে আমরা প্রথমে প্রথম শ্রেণীর সর্বভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ডাকতে চাই। ইকনমিষ্ট, ষ্ট্যাটিষ্টিসিয়ান, সোসিওলজিষ্ট, শিল্পপতি, রাজনীতি-বিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক, জার্নালিস্ট, এঁরা সকলে একত্রে বসুন—বিচার বিতর্ক করে আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূল্যায়ন করুন। তর্কটা দেশব্যাপীই নয়, পৃথিবীব্যাপী হতে বাধ্য। আজ এর চেয়ে বড় সমস্যা ও প্রশ্ন মানুষের কাছে আর কিছুই নেই।

এই সংকলনে আমরা কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর কথাও সংযুক্ত করেছি। তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, স্রেফ এতো প্রাসঙ্গিক বলে। এই সব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কর্মযোগী ও মনীষীরা ভবিষ্যৎ কালের জন্য অনেক কিছু ভেবেছেন, সেগুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ ও পাথেয়। ওঁদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার দাম্ভিকতাটা এখন হয়তো একটু লজ্জিত হয়ে এসেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও আজকাল এসব সাবধান বাণী দিচ্ছেন। এটাও একটা শুভ লক্ষণ।

পরিশেষে আমরা এই বিতর্কযজ্ঞে সবার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

পান্নালাল দাশগুপ্ত

দেশব্যাপী একটি বিতর্কের প্রস্তাব

গত দুই/তিন বছর ধরে আমরা কম্পাসে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি—বিশেষ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধে। কারো কারো দৃষ্টি তাতে হয়তো আকৃষ্ট হয়েছে, হয়তো অনেকেই আবার তার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। বিষয়টি এমন যে তাকে দীর্ঘকাল অবহেলা করা চলবে না, বা চোখ বুঁজে অস্বীকার করা যাবে না। বিষয়টি অ্যাকাদেমিক নয়, ভাইটাল বা সভ্যতার জীবনমরণ সমস্যামূলক।

১৯৭০ সালের শারদীয়া সংখ্যায় 'মধ্যবিত্তের দুঃস্বপ্ন' নামক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই সভ্যতার সংকট সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়। তার পূর্বে ও পরে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন নিবন্ধে ঐ একই সমস্যার বিভিন্ন দিক দেখাতে চেষ্টা করি। আমাদের এই বিশেষ বক্তব্যটিকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ কিছু আজও লেখেন নি, কম্পাসেও নয়, অন্যত্রও নয়। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা আজ এত ক্লান্ত ও বিবশ যে তাদেরকে সহজে কিছুতে উত্তেজিত করে না। নীরবে তালে তাল দিয়ে চলতে থাকেন, বেসুরো কোন কথার জবাব দিতেও তাদের অনীহা। আমরা যা বলছি, বেশ জোরের সংগেই বলছি। তা যে সব ঠিক হতেই হবে তাও নয়, আমাদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভংগীকে চ্যালেঞ্জ করে ততোধিক জোরের সংগেও প্রতিবাদ নিশ্চয়ই আসতে পারে। কিন্তু আসে না। হয় তারা মৃত, নয়তো এমন 'বুদ্ধিমান' যে চুপ করে তা অগ্রাহ্য করার পথই সুবিধাজনক মনে করেন। কিন্তু ব্যাপারটা কতিপয় বুদ্ধিজীবীর সমস্যা নয়, কেবল মধ্যবিত্তদেরই নয়। সমস্যাটা জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক।

আমাদের এই বিশাল দেশের বিপুল জনসাধারণের জীবনমান উন্নত করতে আমরা চাই। দারিদ্রসীমার নীচে পড়ে আছে শতকরা সত্তর জন

লোক। আমাদের দেশের দারিদ্র বাড়ছে বই কমছে না। যদিও এক ধরণের উন্নয়ন বা ডেভেলপমেণ্ট হচ্ছেই। ধান চাল গম ইত্যাদি খাদ্য-শস্যের উৎপাদন স্বাধীনতার পরে দ্বিগুণ হয়েছে ধরে নিলেও দেখতে পাচ্ছি যে দরিদ্রদের ভাগে তার অংশ দিন দিন কমছে বই বাড়ছে না। বেকার সমস্যা চোখে অন্ধকার করে ছাড়ছে। এর ফলে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অনিশ্চয়তার বাতাবরণ দূর হচ্ছে না। সংবিধান নিয়ে পর্যন্ত টান পড়েছে।

যারা কম্পাস রীতিমত পড়েন, তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না আমরা কোন্ কথাটা—আবার তুলছি। কথাটা এই, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আমাদের ডেভলপমেণ্ট পরিকল্পনা দেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথেই চালু হয়। চার চারটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার করে আমরা পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বিতীয় বর্ষে উপস্থিত। পরিকল্পনার বরাদ্দ বছর বছর বেড়েই চলেছে। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকর করতে প্রাণান্ত হতে হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবটা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। এই বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান দাবি মেটাতে আমরা যা কিছু হাতের কাছে, মাটির নীচে, যা পাচ্ছি তা চালান করতে পাগল হয়ে পড়েছি। Export or Perish এই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় শ্লোগান। কয়লা, লোহা, ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, কপার, ম্যাংগানিজ ইত্যাদি যা কিছু মৌলিক সম্পদ এবং যা ফুরিয়ে গেলে আর কোন উপায়েই ফিরে আসবে না তাও আমরা প্রাণপণ শক্তিতে তুলে বাইরে চালান করতে বাধ্য হচ্ছি। তার বাজারদর যদি বিশে পড়ে যেতেও থাকে—সেই ক্ষতিপূরণ করছি সস্তাদরেও অধিক মাল চালান দিয়ে। এর ফলে ৫০/১০০ বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য এসব মৌলিক সম্পদের কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে, সে হিসেব কোন অর্থনীতিবিদ কষতে রাজী নন। যেন ভারতের এই জেনারেশনই সব, এই জেনারেশনের প্রয়োজন ও জীবনমান মেটানো ও রক্ষার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শুধু দেনাগ্রস্তই করে যাচ্ছি না উপরন্তু তাদের জন্য কোন মৌলিক সম্পদও রেখে যাবো না।

ডেভেলপমেণ্ট বা উন্নয়ন কর্মসূচী আমাদের নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু কোন্ ধরণের লক্ষ্য রেখে সেই উন্নয়ন কর্মসূচী নিতে হবে? আমরা কি

ইয়োরো-আমেরিকান মডেলটি চোখের সামনে রেখে আমাদের কর্মসূচী চালু রাখবো ? সমাজতন্ত্রেও শিল্পায়ন চাই, ধনতন্ত্রেও শিল্পায়ন চাই। কিন্তু উপর উপর দেখলেই হবে না। ইস্পাতনগরীর আকাশচুম্বী চিমনি আর ধোঁয়া দেখলেই মনে করার কারণ নেই যে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ছি—এমনকি তা রাষ্ট্রায়ত্ত হলেও সত্যিকার সমাজতন্ত্র না-ও হতে পারে। শেষপর্যন্ত দেখতে হবে কোন্ ধরণের জীবনমান আমরা সৃষ্টি করতে চলেছি। উচ্চমান ভোগবাদী জীবনের ছবি পাশ্চাত্য সমৃদ্ধ দেশগুলি আমাদের দেখাচ্ছে, তা কি আমাদের মত দরিদ্র দেশের কোটি কোটি দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কোন কালেও সম্ভব হবে ? যতটুকু 'উন্নয়ন' এযাবৎ হয়েছে, তার সুফল কি জনসাধারণের স্তরে এসে পৌঁচেছে ? কেন উল্টোটাই দেখতে পাচ্ছি। ধনীরা মনে করছেন, তাদের উন্নতির মানদণ্ড দিয়েই, দেশের ও জনসাধারণের উন্নতির মান বোঝায়। আর এদেশে যতটুকু শিল্পায়ন হয়েছে তা থেকে তৈরী মালপত্র দেশের লোক কিনতে পারছে না, কেননা জনসাধারণের সত্যিকার আয় বা ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে না। ফলে ভারীশিল্পের উৎপাদনের বাজারও বিদেশেই খুঁজতে হচ্ছে। এর ফলে উন্নত দেশগুলি এদেশেরই কাঁচামাল এদেশের সস্তা মজুরের সাহায্যে উৎপাদন করে নিয়ে যেতে সমর্থ হচ্ছে এবং তারই জন্য বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য শেষ পর্যন্ত এসে থাকে।

যাক, এজাতীয় কথা আমাদের কাছ থেকে কম্পাস পাঠকেরা দীর্ঘকাল ধরে শুনে আসছেন। আমরা এখন মনে করছি যে এসব প্রশ্নগুলিকে এখন কেবল কম্পাসের পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণের মধ্যে উপস্থিত করবো, যাতে দেশব্যাপী একটা প্রবল তর্কবিতর্কের ঝড় ওঠে। জানি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাধারণত তার নিজের স্বার্থ, লক্ষ্য ও জীবন-মানের বিরুদ্ধে সহজে সোচ্চার হবে না। তবু শিক্ষা-দীক্ষা ও জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের একচেটিয়া অধিকার আছে বলে তাদের কাছেই প্রথমে প্রশ্নটি তুলতে হবে। কিন্তু তারপর এই প্রশ্নটিকে জনসাধারণের মধ্যেই টেনে নিয়ে যেতে হবে। ব্যাপারটা সহজ হবে না, কেননা জনসাধারণের রুচি ধ্যান-ধারণা ও স্বপ্নকেও এই মধ্যবিত্তরা অনেকটা বিকৃত করতে সমর্থ হয়েছেন। দরিদ্ররা উচ্চমান পরশ্রমজীবী

ভোগবাদী মধ্যবিত্তদের জীবনমানকেই তাদের নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্য বলে ভাবতে সুরু করেছে। তবে এ অলীক স্বপ্ন তাদের জীবনে কোনকালেই ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না, তারা বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাতেই এই দুঃস্বপ্ন থেকে একদিন মুক্তি পাবে এবং নিজেদের উন্নয়নের জন্য নিজস্ব পথ বেছে নেবে।

আমরা মনে করছি যতশীঘ্র সম্ভব একটি সম্মেলন ডাকা প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, শিল্পপতি, সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্র-প্রযোজক, আইনজ্ঞ, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, সংবাদ-সম্পাদক ইত্যাদিদের তাতে ডাকা যেতে পারে। তাঁদের সকলের কাছে সভ্যতার এই সংকট মুহূর্তে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত কি, তা জানতে চাওয়া যেতে পারে। তাঁদের লিখিত মতামত সংগ্রহ করার পর সকলকে এক বিতর্ক সম্মেলনে ডাকা যেতে পারে। এর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি-পর্বের কাজ আছে। যেমন তেমন একটি সাধারণ সেমিনার জাতীয় ব্যাপার করলে চলবে না।

এই বিতর্কসভাতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থিত করা যেতে পারে।

১। সদ্য স্বাধীন উন্নয়নকামী এফ্রো-এশীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক সংকট ও পরনির্ভরতা বাড়ছে কেন? কেন স্বাধীনতা ও উন্নয়ন কর্ম-কাণ্ডের বিশ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি উন্নত দেশগুলির অনেক পেছনে পড়ে যাচ্ছে, উভযের মধ্যে দূরত্ব দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না?

২। কেন দেশের মধ্যেই জনসাধারণের জীবনমান উচ্চবিত্তদের জীবনমানের তুলনায় দিন দিন শোচনীয় হচ্ছে, এবং এখানেও ধন-বৈষম্য বাড়ছে বই কমছে না?

৩। সকলের জীবনমান ও ভোগ্যবস্তুর উপরে একটা সীলিং স্থাপন করার দরকার আছে কিনা। বেশভূষা, বাড়ীঘর, যানবাহন, ভোগবিলাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন সাধারণ লেভেল টানার দরকার আছে কিনা।

৪। Standard of life-এর সাথে standard of living-এর কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে কিনা। উচ্চমান জীবন উপভোগ করলেই উচ্চমানের মনুষ্যত্ব সৃষ্টি হয় কিনা।

৫। জীবনের সার্থকতা বা fulfilment কাকে বলে।

৬। "মোটাভাত মোটা কাপড়"-এর আদর্শ ও কর্মপন্থা চালু করলে দেশ থেকে উদ্যম বা incentive-এর অভাব হবে, না বাড়বে।

৭। বর্তমানে যে ইনসেন্টিভ—ব্যক্তিগত উন্নতির স্বার্থপর প্রেরণা চালু আছে, তাতে দেশব্যাপী দরিদ্র জনসাধারণের কর্মোদ্যম ও উৎসাহ কমে যাচ্ছে কেন? তারা কেন দেশের ডাকে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে এগিয়ে আসছে না? উৎপাদিকা-শক্তি তাদের মধ্যে দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে কেন? কাজকর্মে অনীহা দেখা দিচ্ছে কেন?

৮। সাহিত্যে, শিল্পে, নাটকে, যাত্রায়, কাব্যে, সিনেমায় যেন কোন জাগরণমুখী উদ্দীপনা ও প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় না। সমাজের এই বহিরঙ্গের বা superstructure-এ এত পচন কেন?

৯। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের বাজার নেই কেন? সাধারণ মানুষের চাহিদার ক্ষেত্রে উচ্চমান আধুনিক ফ্যাসানের বিকৃতি যদি দেখা যায় তবে কুটিরশিল্প দাঁড়াবে কিসের উপরে?

১০। দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে ও কৃষ্টি-কালচারের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তনের দরকার আছে কিনা, দরকার থাকলে তা কী করে সম্ভব, নতুন জীবন-বোধ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে কিসের উপরে?

১১। সাধ্যের অতীত সাধ সৃষ্টি করার ফলাফল কি? দুর্নীতির উৎস আয়ের চেয়ে ব্যয়ের বহর থেকেই আসে কিনা।

১২। পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলির বিরুদ্ধে অনুন্নত দেশগুলি কেন জোট বাঁধতে পারে না। অনুন্নত দেশগুলির মধ্যেই বিরোধ দিন দিন বাড়ছে কাদের স্বার্থে এবং কেন?

১৩। কেন অনুন্নত দেশগুলির দেশরক্ষাখাতে বা যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য অর্থবরাদ্দ হু হু করে বেড়ে চলেছে? কেন এই বাবদ অর্থবরাদ্দ গত পনের বছরের মধ্যে এই দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলিতেও দশগুণ বেড়ে গেছে? এর শেষ কোথায়, পরিণাম কি? কেন স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বাধ্য হয়েই হোক দুর্বল দরিদ্র দেশগুলিও বৃহৎশক্তি-বর্গের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে?

১৪। সারা পৃথিবীতেই সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব একটা সাধারণ

জীবন মান বা স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর ক্ষেত্রে সমতা না আনতে পারলে, পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি আনা সম্ভব কি? ব্যালান্স অব টেরার-এর নীতিতে প্রকৃত শান্তি ও নির্ভয়-নির্ভরতা আসতে পারে কি?

১৫। অতিক্ষুদ্র এই পৃথিবী, অতি সীমিত তার সম্পদ। এই সীমিত সম্পদের উপরে অসীম ক্ষুধা মেটাবার সম্ভাবনা সত্যিই আছে কি? ব্যক্তিগত ধন দৌলত ও ভোগের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ সীমা বা নিয়ন্ত্রণ যদি না রাখা হয়, পৃথিবীর মৌলিক সম্পদগুলিকে যদি উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে যাবার দুরাকাঙ্ক্ষাকেই আমরা ইন্ধন দিতে থাকি, তবে মানুষের ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি?

১৬। যারা মনে করেন যে পৃথিবীর বর্তমান এই সংকট সাময়িক, অবাধ ভোগবাদের জন্য উন্নয়নের যাবতীয় রিসোর্স আছে বা আবিষ্কৃত হবে, তারা নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত করুন। শক্তি সংকট বা এনার্জি ক্রাইসিস ও পৃথিবীর বিষাক্ত বাতাবরণজনিত সংকট থেকে মুক্তির বাস্তব পথ কি, তারা দেখান।

এজাতীয় আরও প্রশ্ন আছে। কিন্তু সবগুলিই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নজাত। আবার বলি, এ প্রশ্নগুলি অবাস্তব তর্কবিতর্ক নয়, কেবল বুদ্ধিজীবীদের নয়। বুদ্ধিজীবীরা বরং তাদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জীবন বর্তমান দুর্গতির মধ্যেও ভোগ করতে পারছেন, যার জন্য তারা খুব সোচ্চারও নন। কিন্তু পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোক—যারা পৃথিবীর জনসাধারণ তাদের কাছে এসব প্রশ্ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, জীবন মরণ সমস্যাকুল। তাদের পক্ষে আজ চোখ বুজে থাকা অত্যন্ত বিপদজনক।

আমরা আশা করবো এজাতীয় একটা জাতীয় বিতর্ক সম্মেলন ও গণ আন্দোলনের জন্য যথাযোগ্য সাড়া পাওয়া যাবে। আমরা সর্বসাধারণের মতামত শুনতে চাই, সক্রিয় অংশ নিতে দেখতে চাই দেশবাসীকে—এই জাতীয় বিতর্কে।

৬-৩-১৯৭৬

উন্নত বনাম উন্নয়নশীল দুনিয়া

গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে ডঃ রাউল প্রেবিশকে নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান-ভবনে ভারত সরকারের তরফ থেকে জওহরলাল নেহরু পুরস্কার দেওয়া হয়। রাউল প্রেবিশ অর্থনৈতিক বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, বিশেষ করে উন্নয়নশীল পিছিয়ে পড়া দেশগুলির উন্নতির জন্য কী ধরণের নীতি গ্রহণ করতে হবে তাই নিয়ে তিনি বিশেষভাবে মাথা ঘামিয়ে থাকেন। আর্জেন্টিনা দেশে তাঁর জন্ম এবং বর্তমানে যুক্ত জাতিসংঘের আপদকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত বা ইনচার্জ অফিসার। উন্নত দেশগুলিকে অনুন্নত দেশের জন্য অধিকতর নজর দিতে হবে, তাদের আয়ের একটা বড় অংশ অনুন্নত দেশগুলির জন্য ব্যয় করতে হবে, নইলে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান গ্যাপ বা ব্যবধান লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা দূর করা সম্ভব নয়। অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির উপায় যে মাল্‌টি-ন্যাশানাল কর্পোরেশন জাতীয় সুপার-মনোপলি সংগঠনের দ্বারা সম্ভব নয়, এবং এইসব একচেটিয়া বিশ্বগ্রাসী সংগঠনগুলির মারফতই যে পৃথিবীতে নয়াসাম্রাজ্যবাদের অক্‌টোপাশ বন্ধনগুলি বিস্তৃত হচ্ছে একথাও তাঁর লেখাপত্র থেকে প্রকাশ পায়। এহেন অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত ও নিরলস কর্মীকে ভারত নেহরু-পুরস্কারে ভূষিত করলেন, এটা খুবই যোগ্য পাত্রে সম্মান দেওয়া হয়েছে বলতে হবে।

এই পুরস্কার গ্রহণের সময়ে ডঃ প্রেবিশ যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি-যুক্ত বক্তৃতা দেন, তার সবকটি দিকে যথার্থ মূল্য দেয়নি কিন্তু আমাদের দেশের কাগজগুলি এবং এদেশের পণ্ডিতমহলেও তার কতটা নজর পড়েছে বলা শক্ত। উন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা যাচ্ছে না, তারা পৃথিবীর অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের উপরে ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে রাখতেই ব্যস্ত, তারা তাদের জাতীয় আয়ের এক-

শতাংশও অনুন্নত দেশগুলির জন্য খরচ করতে প্রস্তুত নয়, অনুন্নত দেশ-গুলির দেনার বোঝা কিছুমাত্র কমিয়ে দিতে রাজী নয়, অনুন্নত দেশগুলির প্রাইমারী প্রডাক্টস ও কাঁচামাল উন্নত দেশে ঢোকবার পথে যে প্রতিকূল শুল্কের দেয়াল দাঁড় করানো আছে তা কিছুমাত্র আলগা করতে রাজী নয়—এসব নালিশ ও অভিযোগের সমর্থনে ডঃ প্রেবিশের বক্তৃতাতে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায়, সেগুলিকে খুবই ফলাও করে দেখানো হয়েছে। বস্তুত এইজাতীয় অভিযোগের ভিত্তিতেই ম্যানিলা ডিক্লারেশন ও ৭৭ এর গ্রুপ সংগঠিত হয়েছিল, এবং এইসব সমস্যার সমাধানের পথ বের করার জন্যই বর্তমানে নাইরোবিতে উংটাড-৪ (UNCTAD-4) বা বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্মেলন বসেছে।

কিন্তু ডঃ প্রেবিশ যে ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনার প্রয়োজনের কথা বলেছেন সেখানে আমরা যতটা সম্ভব নীরব হয়েই আছি। কেননা অন্যদের উপরে যাবতীয় দোষ চাপিয়েই যদি নিজেদের দায়িত্ব শেষ করতে পারি তার চেয়ে আর সুবিধাজনক পথ কি আছে? আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে পুনর্বিচারের কথা রাউল প্রেবিশ উত্থাপন করেন। কেননা কোন একটি দেশের সমস্যার সমাধানের সূত্র প্রধানত সেই দেশের অভ্যন্তরেই খুঁজতে হবে। ডঃ প্রেবিশ বলেছেন অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির ধরণ-ধারণ ও পথটা তথাকথিত উন্নত দেশগুলির প্যাটার্ণ অনু-করণের মধ্যে নেই। বরং সেই অন্ধ অনুকরণ করতে গেলেই আমরা মাল্‌টিন্যাশানাল কর্পোরেশান, বৈদেশিক মুদ্রা, নয়া সাম্রাজ্যবাদের পাপচক্রে ঢুকে পড়বো, এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ থাকবে না। 'এক্‌সপোর্ট অর পেরিশ' বা রপ্তানি করো অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে—এই প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত গোটা দেশটাকেই বিক্রি করে দিতে হবে। সকল অনুন্নত দেশগুলি সম্বন্ধেই তাঁর এই যুক্তি যথার্থ। অতএব অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির মডেলটা সেই দেশেরই ধন-জনসম্পদের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে, অন্যের মুকুরে নিজের চেহারা দেখবার মুর্খতা ত্যাগ করতে হবে। তা নইলে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য বা গ্যাপ দূর করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উভয়েই মহাসংকটে পড়ে যেতে বাধ্য। অনুন্নত দেশগুলির সংকট দারিদ্র থেকে উদ্ভূত, কিন্তু দারিদ্র দূর করার অর্থ

দেশটিকে ইয়োরোপ আমেরিকা বানিয়ে দেওয়া নয়। আর উন্নত দেশ-গুলির বর্তমান জীবনমান রক্ষার ও এর চেয়েও উন্নত করার অভিযানে তারা পৃথিবীর মৌলিক সম্পদ ও শক্তিকে ফতুর করে চলেছে, আর তাদের এই অনির্বাণ ক্ষিধে মেটাবার ষড়যন্ত্রে নির্বোধ অনুন্নত দেশগুলি ধনী দেশগুলির অঙ্গুলি-হেলনে লুব্ধ হয়ে নিজেদের ক্রমশঃ বিকিয়ে দিচ্ছে।

ডঃ প্রেবিশের বক্তৃতার আর একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল এই যে, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে সুনীতি-নিয়ন্ত্রিত (ethical direction) করতেই হবে। যা চলছে চলুক বা 'স্বাধীন' অর্থনীতি চলতে পারে না, অর্থনীতির উপর সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ চাই এবং সেই হস্তক্ষেপ হতে হবে সুনীতির প্রয়োজনেই। উৎপাদন ও বণ্টন উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়-নীতির প্রশ্নটি বাহ্য নয়, একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। ন্যায়-নীতিসংগত বণ্টন ব্যবস্থার কোন অটোমেটিক রীতি আজও পর্যন্ত কোন অর্থনীতি-বাদের মধ্যে নেই বলে ডঃ প্রেবিশ বলেন, এমনকি মার্ক্সবাদী অর্থনীতির মধ্যেও ন্যায়সংগত বণ্টন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিকরূপে চালু হতে পারে না, সেখানেও বণ্টনের ক্ষেত্রে সুনীতি বা এথিক্‌সের প্রয়োজনটা আজ সবদিক থেকে অনুভূত হতে বাধ্য। 'সেণ্টার ও পেরিফেরি' থিওরি অর্থাৎ কোন একটি দেশ খুব উন্নত হলেই তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলি (অর্থাৎ পেরিফেরি) সে উন্নতির সুফল পাবে, এই কথা মিথ্যা বলে পরিগণিত হয়েছে। যেমন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে—কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর মত নগর ও তাদের নাগরিকদের উন্নতি হলেই গ্রামভারতও তার উন্নতির ভাগ পাবে—এই ধরণের ধারণাগুলিও। সেখানেও সুনীতিই হবে একমাত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। বণ্টনের বা ন্যায় সংগত বণ্টনের সমস্যাটা শেষ পর্যন্ত সুনীতি বা এথিক্যাল সমস্যা। অতএব সুনীতিকে বাদ দিয়ে কোন প্রকার অর্থনীতি এমনকি সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতিও নিরাপদ নয়।

ডঃ প্রেবিশ আরও বলেন উন্নত দেশগুলির ভোগ বা কন্‌জাম্‌পসান প্যাটার্ন অনুসরণ করে অনুন্নত দেশগুলির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কেননা তাতে যথেষ্ট মূলধন সৃষ্টি হতে পারে না; বিনিয়োগের জন্য মূলধনের অভাব সর্বদাই অনুভূত হবে, বরং মূলধনের অভাব দিন দিন বাড়বে বই

কমবে না, কেননা উন্নত দেশের ভোগ্যমানের অনুকরণ করতে গিয়ে ভোগের জিনিষ কিনতে গিয়েই মূলধন ফুরিয়ে যেতে থাকবে। অথচ অনুন্নত দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নত দেশগুলিতে মূলধন সঞ্চয়ের হার থেকে অনুন্নত দেশে সে সঞ্চয়ের হার আরও অনেক বেশী হওয়া দরকার। ভোগ্যমান স্থষ্টির ব্যাপারে অথবা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ব্যাপারে কোন ক্ষেত্রেই অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে উন্নত দেশগুলির আদর্শ বা পথ বেছে নেওয়া ঠিক নয়। তিনি এ কথাও বলেন যে তথাকথিত উন্নত টেকনোলজির নামে আমরা যেন আমাদের মানবিক মূল্যবোধগুলির আর ক্ষয় হতে না দিই। কেননা এই মূল্যবোধগুলি ছাড়া কোনপ্রকার ভদ্র সভ্যতা স্থষ্টি করা সম্ভব নয়। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা চলবে না।

এখন লক্ষ্য করে দেখুন নাইরোবিতে যে ধরণের তর্ক বিতর্ক চলছে তাতে ডঃ প্রেবিশের আত্মজিজ্ঞাসাজাতীয় কোন প্রশ্ন কোন মহল থেকে—কী উন্নত কী অনুন্নত কোন দেশের কোন প্রবক্তার কাছ থেকে এসেছে কিনা। অনুন্নত দেশগুলির তরফ থেকে এবং উন্নত দেশগুলির তরফ থেকে—অর্থাৎ উভয় দিক দিক থেকেই একটা ইন্টিগ্রেটেড বিশ্ব-অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর ধন জন খনিজ সম্পদ জৈব জ্বালানি, খাদ্য জল স্থল সমুদ্র আকাশ—সবকিছু মিলিয়ে একটা সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী করা হোক—এজাতীয় দাবি পরস্পর-বিরুদ্ধ দুই পক্ষ থেকেই সমানে চীৎকার করে বলা হচ্ছে। অথচ কেউ কিন্তু নিজেরটুকু ছাড়তে রাজী নন। আমেরিকা তার জাতীয় আয়ের ১ ভগ্নাংশও দিতে রাজী নয়, অথচ পৃথিবীতে যেখানে যত কয়লা তেল ধাতুজ পদার্থ আছে তাদের উপরে সকলের সঙ্গে তাদেরও হাতটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে থাকা চাই। আর বুভুক্ষু দেশ, চিরদরিদ্র, অথচ উন্নয়নশীল বা উন্নয়নকামী, তারাও তাদের ভোগ বিলাসের ধরণ-ধারণটা নির্ণয় করছে উন্নত ভোগী দেশগুলির মাপ-কাঠিতে অথচ নিজেদের দেশের দারিদ্র সীমার নীচে-পড়া নীচুতলাকার লোকগুলির জীবনমান সহনীয়ভাবে একটু উন্নত করা যায় কোন্ ভিত্তিতে ও কোন্ পথে সেদিকে নজর দিতে প্রস্তুত নয়। উন্নত

টেকনোলজী ও উন্নত জীবনমানের লোভে—দরিদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যেও সত্যিকার কোন জোট বাঁধতে পারবে না কেননা ব্যক্তিগত লোভই যেখানে সংগ্রামের প্রেরণা সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা ও দলত্যাগটাই স্বাভাবিক পরিণতি। উন্নত টেকনোলজির মধ্যে পারমাণবিক শক্তির প্রতি লোভটাও কম নয়, যুদ্ধাস্ত্র কেনা-বেচার ক্ষেত্রেও নানা ধরণের গোপন চুক্তির শিকার তারা হয়, মাল্টিন্যাশানল পুঁজিতন্ত্রের সরিক হয়ে দেশকে বিকিয়ে দিতে দেখা যায়। কিন্তু এ জাতীয় অধঃপতন ও ক্রমবর্ধমান পরাধীনতা ও অসহায়তার পাপ চক্রটি সৃষ্টি হচ্ছে যে উন্নত দেশগুলির ধরণ-ধারণ অনুকরণ করতে গিয়েই—সে কথাটি পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির উপর তলাকার লোকেরা স্বীকার করতে রাজী নয়, এবং নীচের তলাকার লোকদেরও সচেতন করতে উৎসাহী নয়। কাজেই উংটাড সম্মেলনে যত গরম গরম কথাই উঠুক না কেন, সত্যিকার সমাধানের পথ কিছু বের হবে বলে আশা করা যায় না। ইতিমধ্যেই ১০টি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একটি বিশ্বমজুত বা ইন্টিগ্রেটেড কমোডিটি প্ল্যান তৈরী করতে যে তিন বিলিয়ান ডলারের একটা বিশ্ব ভাণ্ডার বা ফাণ্ড করার প্রস্তাব অনুন্নত দেশগুলির তরফ থেকে আসে, আমেরিকা ও উন্নত দেশগুলি তা বাতিল করে দিয়েছে। আবার আমেরিকা একটা এমন পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছে যাতে অনুন্নত দেশগুলির সত্যিকার স্বাধীনতা তাদের নিজেদের দেশের সম্পদের উপরেই নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলির উপর-তলাকার লোকদের ভোগবিলাসের যাবতীয় সুবিধাগুলির বিনিময়ে উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে কব্জা করে নিয়ে তাদের উপর আরও নির্ভরশীল ও অসহায় করে ছাড়বে। ধনী-দরিদ্র সব দেশেই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলছে, কিন্তু কিসের ভিত্তিতে এই সহযোগিতা—কোন্ ধরণের জীবনমানের জন্য এবং কাদের জন্য সেই জীবনমান, এ প্রশ্নটি আজ উপস্থিত—কেননা প্রত্যেক দেশেই ধনী ও দরিদ্র আছে, প্রত্যেক দেশ আজ দ্বিধা বিভক্ত—অতএব কোন্ দেশের ও কোন্ অংশের উন্নতির জন্য এই সহযোগিতা? এই সর্বগ্রাসী পশ্চিমী ক্ষুধার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে যেটা দরকার সেটা হল এক ধরণের বা নতুন

ধরণের অসহযোগ ও স্বদেশী আন্দোলন—এবং সে ধরণের অসহযোগ ও স্বদেশী বা আত্মনির্ভর অর্থনৈতিক আন্দোলন কখনো নয়া সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে সহযোগিতায় করা সম্ভব নয়, অন্তত তাদের টার্মসে নয়। এই ধরণের আত্মনির্ভর ও আত্মসম্মানজনক ষ্ট্যাণ্ড নিতে হলে আমাদের মৌলিক জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু মূল্যায়ণ করার দরকার আছে। ডঃ রাউল প্রেবিশ সে নৈতিকতার একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র। তাই যথেষ্ট নয়, আরও গভীরভাবে এই প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণ ও বিধানের পথ বের করতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রা-রাক্ষস বনাম লোকশক্তি

বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্য আমাদের বহির্বাণিজ্যকে আপ্রাণ বাড়াতে হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান চাপ আসছে বিদেশ থেকে পেট্রোল-ক্রুড আনার প্রয়োজনে। এই ক্রুড অয়েলের দাম চারগুণ বেড়ে যাওয়াতে আমাদের তেল আমদানী বাবদ বিল ১৯৩০ সালে উঠে দাঁড়ায় ১২০০ কোটি টাকায়। এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে দেশের যাবতীয় মুল সম্পদ চালান করতে তো হবেই, এমন কি ভোগ্য-বস্তুও চালান করতে হবে—দেশের লোককে বঞ্চিত করে। কাজেই এখন একটা ধূয়ো উঠেছে—কোন কিছু উৎপাদনের কথা যখনই ওঠে, দেখতে হবে তার উৎপাদনের বৈদেশিক বাজার আছে কিনা।

যদি আমরা এই ক্রুড আমদানির ব্যাপারে কিছু কম করতে পারি, অর্থাৎ যদি দেশের ভিতরেই এই তেল আবিষ্কার ও উদ্ধার করতে পারি—যেমন আজ বোম্বেহাই থেকে তোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে, তবেই বোধহয় আমরা ক্রুডের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হতে পারবো, এবং যে পরিমাণে তা পারবো সে-পরিমাণে আমাদের এই অগ্নিমূল্যের ক্রুড বৈদেশিক মুদ্রায় আনার বোঝা থেকে মুক্ত হবো।

কিন্তু সন্দেহ আছে যে এই ক্রুডের ব্যাপারে আমরা কোন কালেই স্বয়ম্ভর হতে পারবো কিনা। তাছাড়া এই খনিজ তেল একদিন ফুরিয়ে যাবেই। সারা পৃথিবীতে যত তেল মাটির নীচে আজ মজুত আছে বলে বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে বড় জোর আগামী পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তা চলতে পারে। আমাদের দেশেও যত মজুত আছে বলে ধরা হয় (বোম্বেহাই ছাড়া) তাতে বড় জোর ১৭ বছর চলতে পারে যদি যে-হারে বর্তমানে তেল খরচ হয়, সেই হারই থাকে। কিন্তু আসলে তেলের চাহিদা দিন দিন বাড়ে বই কমে না। ভারত সরকারের

ফুয়েল পলিসি কমিটি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির হার ৬·৯ শতাংশ (বছরে) বলে ধরেছেন। এই হিসেবে আরও দ্রুত সম্পদ ফুরিয়ে যেতে পারে—যদি না বোম্বেহাই থেকে অভিনব কোন মিরাকেল আবিষ্কার হয়।

এই সংকট থেকে মুক্ত হবার পথ কি কি? এক হলো, ক্রুডের ব্যবহার কমানো; দুই হলো, কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা। ক্রুড অয়েল থেকে রিফাইনারীর সাহায্যে তৈরী হয় পেট্রোল, নাপথা, কেরোসিন, ডিসেল অয়েল, ফুয়েল অয়েল ইত্যাদি। আবার নাপথা থেকেই আসে ফার্টিলাইজার বা নাইট্রোজেন ঘটিত সার। ক্রমবর্ধমান রাসায়নিক সারের চাহিদা কী করে মেটানো যাবে এইটাই এই নিবন্ধের বিচার্য বিষয়। অন্যান্য কথা আনুষঙ্গিক মাত্র। কিন্তু তার পূর্বে—একটা কথা পরিষ্কার থাকা দরকার যে বোম্বেহাই অথবা উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চল থেকে তৈল তুলে আমরা যদি স্বয়ম্ভর হই তবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি থেকে রেহাই পাবো—এজাতীয় ধারণাটা কিছু বিশেষণ-সাপেক্ষ। তেল সন্ধান ও উত্তোলনের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও ভারী রিগ মেশিনের দরকার হয় তার ৮৫%-ই আসে বিদেশ থেকে, আর বোম্বেহাই'র সমুদ্র থেকে তেল তোলার জন্য যা কিছু লাগে—প্ল্যাটফর্ম সহ তার শতকরা ১০০ ভাগই আসবে বিদেশ থেকে। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা রাক্ষসের আগ্রাস থেকে বাঁচতে গিয়ে আর একভাবে সেই বৈদেশিক মুদ্রা রাক্ষসের কবলেই পরছি। হয়তো ভাবা যেতে পারে, পরে তো এসব যন্ত্রপাতি আর কিনতে হবে না, কিন্তু ততোদিনে ভারতের মাটিতে ও সমুদ্রে সর্বত্রই তেল ফুরিয়ে যেতে পারে তো! তখন পড়ে থাকবে রিগ, প্ল্যাটফর্ম ও ভারী ভারী যন্ত্রপাতিসমূহ—যাদের কোনই কাজ থাকবে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার ব্যাপারটা কী সেটা সবদিক থেকেই ভাবতে হবে—একটা ফুটো মারতে গিয়ে যেন আরও দুটো ফুটো তৈরী না করি।

তেল জিনিসটা যত সত্বর ও যত সহজে ফুরিয়ে যাবার কথা, আমাদের কয়লা সম্পদটা তত সত্বর ফুরিয়ে যাবার কথা নয়। অবশ্য এই কয়লাও অফুরন্ত নয়, এবং সব কয়লাতেই সব কাজ হয় না।

কয়লা থেকে রাসায়নিক সার করা চলে, এবং তা কেমন করে করা যেতে পারে তার পদ্ধতিও আমাদের জানা আছে। জার্মানিতে দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্তও কয়লা থেকে সার ও অন্যান্য কেমিক্যাল তৈরী হোতো। তা সস্তা নাপথার লোভে এই অপেক্ষাকৃত শক্ত পথটি ছেড়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য পুরোদমেই কয়লা থেকে সার তৈরী করে থাকে। ভারতবর্ষেও গোটি কয়েক (তিনটি) কয়লা থেকে সার তৈরীর প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেই আবার বোম্বেহাই'র তেলের সন্ধান মিললো, অমনি আবার আমরা আনন্দে নেচে উঠছি, নাপথা থেকেই সব করতে পারবো ভাবছি, যেন অফুরন্ত সম্পদের উৎস খুঁজে পাওয়া গেলো—সঙ্গে সঙ্গে আরো বিশটি রিফাইনারী চালু করার জন্য পাগল হয়ে পড়েছি। কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় বোম্বে-হাইয়ের তেল কতটুকু এবং কতদিন পর্যন্ত তাতে চলবে? কাজে কাজেই কয়লা থেকে সার তৈরী করার কথা আবার বেশী করে ভাবতেই হবে, এবং মিথ্যা আশায় বসে থাকলে চলবে না।

আবার দূরপাল্লার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে একথাও মনে রাখতে হবে যে কয়লাও আমাদের ফুরিয়ে যেতে পারে—এবং যে সমস্ত ধাতুজ ও জৈব জ্বালানি সম্পদ একদিন ফুরিয়ে যাবে—এবং এখনই অতি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, সে সব সম্পদ যত কম ব্যবহার করতে পারা যায় ততই মানুষের ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততি ও মানুষের সভ্যতার পক্ষে মঙ্গল। ডাকাতের মত এই জেনারেশন যেন পৃথিবীর যাবতীয় ভবিষ্যতকে লুটে পুটে উজাড় করে না দিয়ে যায়।

অথচ আমাদের ক্রমবর্ধমান খাদ্যোৎপাদনের কার্যক্রমে কোন রকমেই ঢিলে দেওয়া চলবে না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো বা শূন্য করলেও, বর্তমান অনাহার ও অর্ধাহারের কবল থেকে দেশবাসী জনসাধারণকে মুক্ত করতেই হবে। এ অবস্থায়, যদি তেল ও কয়লা উভয় উৎস থেকেই সার তৈরীর ক্ষমতা দিন দিন কমে এসে থাকে, অথবা তেল ও কয়লা মজুত রাখবার জন্য তার যথাসম্ভব কম ব্যবহারের পথ নিই, তবে কোন্ বিকল্প পথে প্রয়োজনীয় সার যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে বা উৎপাদনের হার বন্ধ না হয়ে বৃদ্ধি পাবে?

গোবর সার, কম্পোষ্ট ইত্যাদির ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করার

কথা যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত বলেই দেখা যায়। তথাপি এসব দিকে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি হচ্ছে না কেন? অথচ কেমিক্যাল সারই যে খুব একটা ব্যবহার হচ্ছে বা চাষীরা ব্যবহার করতে পারছেন তাও নয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৩৮ লক্ষ একরে যত রাসায়নিক সার বছরে ব্যবহৃত হয় তার গড় হিসেব করলে দেখা যায়, গড়ে একর প্রতি ১০ কেজির বেশী সার ব্যবহৃত হয় না। যদি সব জমিতেই একাধিক চাষ করা হয় এবং উচ্চফলনশীল উন্নত জাতের চাষ করা হয় তবে একরে অন্তত ১২০ কেজি সারের দরকার হবেই। এই গড়ে ১০ কেজি সার যোগান দিতেই আমাদের হিম-সিম খেতে হচ্ছে—গড়ে ১০০ কেজির যোগান দিতে গেলেই দেখা যাবে যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা জোগাবার ক্ষমতা সারা দেশটা বিক্রি করে ফেললেও হবে না, শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে যে ক্রমবর্ধমান বাড়তি দামের তেল আমদানি করতে যত বৈদেশিক মুদ্রা লাগবে, বৈদেশিক শস্য আনতেও হয়তো তার চেয়ে বেশী দরকার হবে না। সেই পুরোনো পাপচক্রেই ঘুরে ঘুরে মরতে হচ্ছে, এবং পৃথিবীর এই সম্পদ যত ফুরোতে থাকবে, তেলের দাম ততই বাড়তে থাকবে, এতো অতি সাধারণ সত্য।

কিন্তু এই পাপচক্র থেকে মুক্তি কোন্ পথে? এক কথায় বলা যায় যে, যে-সব সম্পদ থেকে জ্বালানি শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, সার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু ও শক্তি আমরা সংগ্রহ করি তা যদি সীমিত বলে জানি, অর্থাৎ একবার ফুরিয়ে ফেললে আর ফিরে পাবো না, তবে তার থেকে আমরা ধীরে ধীরে সরে আসবো। আর যে-সব উৎস বা সোর্স প্রকৃতি থেকে ঘুরে ঘুরে পাই, সেই সমস্ত শক্তি ও সম্পদের উপরেই আবার নির্ভরশীল হতে শিখতে হবে। শক্তির উৎস প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে হলো খনিজ তেল ও কয়লা ও পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজনীয় যৌগিক ধাতু যথা ইউরেনিয়াম ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয় উৎসগুলি হলো—সৌর-শক্তি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার ব্যবহার। জলশক্তি—যথা নদীর গতিবেগ বা স্রোত, জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার ব্যবহার থেকে শক্তি, গাছপালা বা ফটোসিনথেসিসের সম্পদ ও শক্তি—যা সৌরশক্তির পরোক্ষ দান, বাতাসের শক্তি ও পৃথিবীর গভীরে যে বিপুল

তাপসম্পদ রয়েছে তার ব্যবহার থেকে শক্তি সংগ্রহ। এগুলি অফুরন্ত। এগুলি প্রকৃতিতে ঘুরে ঘুরে আসে, ফুরিয়ে যায় না। এগুলির উপরে ভরসা করেই মানুষ হাজার হাজার কেন লক্ষ লক্ষ বৎসর কাটিয়ে এসেছে। যদিও সভ্যতার তালটা এমন গতিবেগ সম্পন্ন ছিল না। পাগলের মত গতি সৃষ্টি হলো সভ্যতার অভ্যন্তরে—যখন এসব প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তির উপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে সস্তায় কয়লা, তেল আর ইউরেনিয়ামের জন্য এগিয়ে গেল মানুষ। প্রতিযোগিতা ও ভোগের তাড়নায় সে সব সম্পদ প্রায় ফুরিয়ে এনেছে। যদি এই পথ থেকে এখনই ফেরা না যায়, তবে সমূহ সর্বনাশ থেকে মানুষের রক্ষা নেই। ফিরতে হবে কোথায়? সেই প্রাকৃতিক অফুরন্ত শক্তি—সৌরশক্তি, বায়ু ও জলশক্তি ইত্যাদির উপরেই। কিন্তু ফিরতে হলে আমাদের হাল-চাল ও সভ্যতার ধরণ-ধারণকেও পাল্টাতে হবে—সেখানেও মোড় ফেরাতে হবে।

কিন্তু এই সব অফুরন্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে যে শক্তির দরকার হয় সৌভাগ্যবশত সেই শক্তিটাও আজ আমাদের প্রায় অফুরন্তভাবে উপস্থিত। সে হচ্ছে জনবল বা লোকশক্তি বা unlimited man-power বিশেষ করে আমাদের মত দেশে। পশুবল (animal power)-টাও আমাদের বিপুল। উপরোক্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে এই লোকশক্তি ও পশুশক্তির সাহায্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি কিনা, আজকের প্রয়োজনের নিরিখে, সেটাই আজ দেখবার বিষয়। অতীতে যেভাবে যেহারে এই শক্তির ব্যবহার হোতো তার চেয়ে নিশ্চয়ই উন্নতভাবে তার ব্যবহার করার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি আমাদের আছে, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকেও সেভাবে নতুন করে নতুন প্রয়োজনের নিরিখে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া এই সমস্ত ট্রপিক্যাল দেশসমূহে প্রচুর রৌদ্র বা সৌরশক্তি, তা থেকে মেঘ ও বৃষ্টির প্রাচুর্য ও গাছ-গাছড়ার প্রচুর উদ্ভব ও সমাগম—অর্থাৎ প্রকৃতির অদ্ভুত ও অজস্র দাক্ষিণ্য আছে। আর লোক বা লোকশক্তির কোন অভাব নেই।

কিন্তু এই লোকশক্তিকে কাজে লাগাতে আমরা পারি না—তারা প্রায়ই বেকার থাকে, এবং যতটুকুও বা কাজ পায় কাজে কোন উৎসাহ

থাকে না, কেননা নিজ নিজ শ্রমজাত উৎপাদনের উপরেও তাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার নেই, পদে পদে আছে বঞ্চনা ও অপমান। রাসায়নিক সার আমরা যদি নাও পাই বা খুব কমই পাই, কিন্তু জৈব সার ও কম্পোষ্ট সারের ব্যবহার যদি যথাযথভাবে করি ও সেচব্যবস্থা যথাযথভাবে (water management) করি, উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করি তবে এমনিতেই গড়ে উৎপাদন আমাদের বিঘা প্রতি দুই মণ করে বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা করতে হলে কী চাই ? প্রথমত দেখতে হবে শ্রমের যথাযথ মুল্য প্রত্যেক কৃষি শ্রমিক পাচ্ছে কিনা। অধিক উৎপাদনের সাথে সাথে কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ও ভাগ চাষীও লাভবান হচ্ছে, মানুষ কোথাও বঞ্চিত হচ্ছে না। দ্বিতীয় জিনিসটি হলো মানুষে মানুষে সহযোগিতা হচ্ছে কিনা, প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা প্রাধান্য পাচ্ছে কিনা—সমবায়িক মনোভাব ও কার্যক্রম বাড়ছে কিনা। কেননা সমবায় ছাড়া এই বিপুল জনবলকে মহান কোন কর্মযজ্ঞ ব্রতী করে তোলা যায় না—যেখানে শোষণ নেই, এবং প্রতারণা ও বঞ্চনারও কোন ক্ষেত্র নেই। এই ধরণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেতনা ও প্রেরণা ভিন্ন, অফুরন্ত (recyclable বা inexhaustible) প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা চলে না। রৌদ্র, জল, বৃষ্টি, বাতাস, মাটি, এই সব বিপুল যোগানগুলিকে একটু একটু করে ব্যক্তিগত আঙ্গিনায় কব্জা করা যায় না। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের হাত তাতে একযোগে লাগাবার পথ করে দিতে পারে। তখনই কাজে ফাঁকি ও অনুৎসাহ বা অনীহা থাকবে না, এবং সমবেত শ্রম শক্তির বিপুল প্রয়োগ সম্ভব হবে। ভূমি সংরক্ষণ বা অবক্ষয় নিবারণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, মানুষের ও পশুর মলমূত্র ও সহর ও গ্রামের আবর্জনার কম্পোষ্ট তৈরী করানো ও তার যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজগুলি সে অবস্থাতেই করা সম্ভব যেখানে সকলের স্বার্থ এক এবং একজন অপরের শ্রমের উপরে বসে খাবে না। বস্তুত চাষের কাজে দেখা যায় রাসায়নিক সারের খরচের চেয়ে সেচের খরচটা বেশী। কিন্তু উপযুক্ত হাতনালা, পাশনালার অভাবে প্রচুর জলের অপচয় ঘটে, জলের খরচ অতিরিক্ত পড়ে, সারে অপচয়ও ঘটে তার ফলে অনেক। বন সম্পদ

রক্ষা করা, সৃষ্টি করা ও তার যথাযথ ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও সহ-যোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা দরকার। মোটকথা এধরণের কাজগুলি যেমন labour-intensive, তেমনি mass-based, এই শক্তিটা আমাদের বিপুল পরিমাণে আছে কিন্তু উপযুক্ত সামাজিক ব্যবস্থার অভাবে বা প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থায়, তার ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। যদি হয়, তবে রাসায়নিক সার ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাবটা অনেক সহজেই দূর করে দেওয়া চলে, এবং সমাজেও সাধারণ সচ্ছলতা আনা সম্ভব সকলের জন্য—মোটামুটিভাবে—অথচ পৃথিবীকে মানুষের জন্য অন্তঃসারশূন্য করতে হয় না।

বিশ্বশান্তি আর কত দূরে

পূর্ব ও পশ্চিমী জগতের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঠাণ্ডা লড়াই চলেছিল, তা একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকা ও অপর দিকে রাশিয়ার মধ্যে, অপরদিকে চীন ও আমেরিকার মধ্যে তথাকথিত দেতাঁত বা শান্তির জন্য নানা ধরণের যোগাযোগ স্থাপনের ফলে পৃথিবীতে শান্তি শেষ পর্যন্ত আসছে বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু যে পরিস্থিতি এই বৃহৎ শক্তিবর্গ এখনও পর্যন্ত করতে পেরেছে তাকে 'না-যুদ্ধ না-শান্তি' এ জাতীয় একটা অনিশ্চিত অবস্থা বলা চলে। হেলসিঙ্কি চুক্তি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে একটা সমঝোতা আনয়নের চেষ্টা বটে, তবে ঐ চুক্তি থেকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী বন্ধকরণ বা সীমিতকরণের কোন সর্ত নেই, বরং তারপরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিযোগিতা চালু আছে। বৃহৎ শক্তিগুলি অনুন্নত ও ছোট ছোট দেশগুলিকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য যে ধরণের অপচেষ্টা করে চলতো, তাতে কোন ঢিলেমি এসেছে এমন মনে করার কারণ নেই। এইসব অনুন্নত দেশগুলির দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে নানাভাবে তাদের ভিতরকার রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নিরলস চেষ্টা চলেইছে। আমেরিকা বর্তমান মুহূর্তে রাশিয়ার সংগে একহাত যুক্ত করলেও, অন্যহাতে চীনকে ধরবার সম্পর্ক স্থাপন করলেও, আমেরিকার দুই হস্ত দুই বিপরীত উদ্দেশ্য থেকে প্রসারিত। রাশিয়া, আমেরিকা ও চীন এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর সংযুক্ত দেখা গেলেও, উদ্দেশ্য প্রত্যেক বাহুর স্বতন্ত্র—কোন ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব-শান্তির প্রচেষ্টাতে তা লিপ্ত নয়। হেলসিঙ্কি সম্মেলনে চীন, ভারত প্রভৃতি এশীয় বা আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার কোনই প্রতিনিধি স্থান পায়নি।

ইতিমধ্যে থার্ড ওয়ার্ল্ড বা তৃতীয় জগতের প্রশ্নটা প্রকট হয়ে উঠেছে। পাঁচ-দশ বৎসর পূর্বেও এই তৃতীয় জগতের অস্তিত্বটা খুব একটা রাজনৈতিক

ভাবে গ্রাহ্য বিশ্বসমস্যা বলে স্বীকৃত হতো না। একদা যুগোশ্লাভিয়ার টিটোর মুখে যখন তৃতীয় জগতের কথা উত্থাপিত হয়েছিল, তখন টিটোকে একটা অবান্তর প্রশ্নের উত্থাপন করা হচ্ছে বলে অনেক মহলেই নিন্দা করা হয়, বিশেষ করে ষ্টালিন নেতৃত্বে কমুনিষ্ট জগতের পক্ষ থেকে। এফ্রো-এশীয় সদ্য স্বাধীন দেশসমুহের মধ্যে যে কয়েকটি সম্মেলন হয়, জওহরলাল নেহরু, চু-এন-লাই, সোকার্নো, টিটো ইত্যাদি নেতাদের নেতৃত্বে, তখনও সেটাকে তৃতীয় জগৎ বলে কোন বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হতো না। পণ্ডিত নেহরুও তৃতীয় জগতের বিশ্বাসী ছিলেন না। উপরন্তু এইসব অনুন্নত বা উন্নয়নকামী বা উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থ নিজ নিজ উপায়েই কার্যকর করার জন্য রাশিয়া ও আমেরিকা এই প্রধান দুই প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক স্থাপন করেই চলতে চেষ্টা করে। এরা সকলেই এই দুই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে যে যতটুকু সুবিধা সুযোগ পায় তার জন্য সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে। ইতিমধ্যে কমুনিষ্ট জগতের মধ্যেই ভাংগন ধরার ফলে যে অবস্থা ও পরিস্থিতি ঘটে, তাতে মতাদর্শ বা ইডিওলজিক্যাল নির্ভরতা কিছু থাকে না। সমস্ত আবহাওয়াটাই এখন সুবিধান্বেষী এক ধরণের 'বাস্তব' কূটনীতিতে পরিণত হয়েছে। কে কার সংগে কখন হাত মেলাতে পারে তার কোন আদর্শগত মানদণ্ড আর নেই। বৃহৎ শক্তিগুলি ছোট ছোট দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট এই সেদিনই পরিষ্কার করে ঘোষণা করে দিলেন যে বৈদেশিক ব্যাপারে আমেরিকার তৎপরতা তিনি কিছুমাত্র কমাতে রাজী নন। ভিয়েতনামে আমেরিকার শোচনীয় পরাজয়ের পরে পাছে আমেরিকা বিশ্বরাজনীতি থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, এই আশংকা থেকে চীন নাকি চায় যে আমেরিকা যেন পূর্ব-এশিয়ায় তার অবস্থিতির নীতি ত্যাগ না করে, কেননা আমেরিকা এই সব পূর্বাঞ্চল থেকে হাত গুটিয়ে নিলে সেই 'শূন্যস্থান' নাকি রাশিয়ার 'সোস্যাল-ইম্পিরিয়ালিজমের' পরিপূর্ণ এক্তিয়ারে চলে যাবে। ভারতের সংগে রাশিয়ার বন্ধুত্বই চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের এই তিক্ততা সৃষ্টি করেছে। এই বিচিত্র জটিল রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চক্র-চক্রান্তের জালে পৃথিবী—বিশেষ

করে অনুন্নত বা উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশগুলি এমনভাবে জড়িয়ে পড়ছে যে তৃতীয় জগতের নিজস্ব কোন পরিষ্কার ঐক্যবদ্ধ পথ সৃষ্টি হতে বিস্তর বাধা সৃষ্টি করছে।

এদিকে উন্নত দেশগুলির সংগে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক পার্থক্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনুন্নত দেশগুলির রিলেটিভ ও অ্যাবসোলিউট দারিদ্র বেড়েই চলেছে। উন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরতা তথাকথিত স্বাধীন দেশগুলির ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অনুন্নত দেশগুলির কাঁচামাল বিক্রয় করে তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কূলকিনারা করতে পারছে না। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির বহর দিনকে-দিন বেড়েই চলেছে। এক্সপোর্ট, এক্সপোর্ট আর এক্সপোর্ট, এজাতীয় একটা নাভিশ্বাস-জাতীয় প্রাণান্তকর আওয়াজ উঠেছে। অনুন্নত দেশগুলির যা কিছু এক্সপোর্ট করার জিনিস, তার দাম যাচ্ছে কমে, অথচ যা আমদানী করতে হয়, উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে, তার দাম গেছে বেড়ে। যেমন কয়েক বছর আগে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে আমেরিকা থেকে একখানা জীপ গাড়ী কিনতে বিনিময়ে যেখানে দিতে হতো ১২৪ বস্তা কফি, আজ এই ১৯৩০ সালে তা কিনতে দরকার হয় ৩৪৪ বস্তা কফি!

তেল বাদে অন্য কোন বাণিজ্য ব্যাপারে অনুন্নত দেশগুলির এমন কোন তেমন বস্তু নেই, যা নিয়ে উন্নত দেশগুলির এই অসম-প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করার ক্ষমতা আছে। মধ্য এশিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার আরব রাজ্যগুলি তাই তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে উন্নত দেশগুলির মাথা কিঞ্চিৎ ঘুরে গেছে, এমনকি আমেরিকা এমন হুমকিও দিচ্ছে যে দরকার হলে তারা বলপ্রয়োগও করবে। বলপ্রয়োগ করার আগে অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিকে—যাদের তেল নেই—তাদের হাত করার জন্য চতুর কূটনীতি চালিয়ে চলেছে। অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে ভাংগন ধরিয়ে দিচ্ছে—এমনকি আরবজগতেও। অনুন্নত দেশগুলিকেও এই চড়াদরের তেল কিনতে গিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিরাট ঘাটতি বহন করতে হচ্ছে—বিদেশী তেলনির্ভর উন্নয়নকর্মসূচী ও 'আধুনিক' সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে দেশের ভিৎটাকে পর্যন্ত বিপন্ন করে

তুলেছে। ওদিকে উন্নত দেশগুলি বলতে সুরু করেছে, জগতে মাত্র তিনটি গোষ্ঠি নেই, পূর্ব, পশ্চিম ও অনুন্নত দক্ষিণ; চতুর্থ আর একটা জগৎ স্বষ্টি হয়েছে, অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে যাদের তেল সম্পদ নেই তাদের নিয়ে। এই চতুর্থ জগতের সংগে তৃতীয় জগতের একটা বিরোধ স্বষ্টি করাই তাদের লক্ষ্য।

তৃতীয় জগতের লিমা-সম্মেলনে একটা সম্মিলিত দাবি উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়—উন্নত দেশগুলির সামনে। অনুন্নত এশীয় আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ধাতুজ ও অন্যান্য কাঁচামালের ক্ষেত্রে যাতে নিজেদের মধ্যে নানা ধরণের জোট বা কার্টেল স্বষ্টি করে সমৃদ্ধ জগতের সংগে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে তার জন্য চেষ্টা ভারতও করে থাকে। লৌহ-আকর, বক্ সাইড (অ্যালুমিনা), তামা, টিন, রবার, কফি, পাট, চা, কলা, কোকো ইত্যাদি দ্রব্যের দাম যাতে সবাই বেঁধে দিয়ে, আরবদের তেলের দাম বাড়াবার মত একটা শক্তি অর্জন করার চেষ্টা হয়। কিন্তু দেখা গেছে এসব ব্যাপারে উন্নত উত্তর দেশীয় দেশগুলির নির্ভরতা অতটা নয়, তাছাড়া অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে (যেমন ভারত ও পাকিস্তান) এত দ্বন্দ্ব যে সেসব দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে ওদের কোন অসুবিধা হয় না। ফলে তৃতীয় জগতের এই জোট বাঁধবার চেষ্টা ভিতর থেকেই ফাঁক হয়ে যেতে থাকে। দরিদ্র দেশগুলির দারিদ্র এত বেড়ে চলেছে যে কোন নৈতিক-ষ্ট্যাণ্ড তাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাদের এই 'হ্যাণ্ড টু মাউথ' পরিস্থিতির দুর্বলতার জন্য ভিতরে ভিতরে ঐক্যবিরোধী টোপ অনবরতই গিলতে হচ্ছে।

দরিদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক সংকট সর্বদাই রাজনৈতিক একটা সংকট স্বষ্টি করে রেখেছে। আভ্যন্তরীণ ক্যু-দ্য-তা বা খুন-খারাবির রাজনীতি চালু হয়ে গেছে, গণতান্ত্রিক স্থিরতা ও শালীনতার পরিবর্তে দেশে দেশে গান-ম্যান বা কিলার বা খুনী রাজনীতির, প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে তার নানা চক্র-চক্রান্ত চলেইছে—উপরন্তু বৈদেশিক উস্কানিও তাতে আছে। প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র কিনতে বাধ্য হচ্ছে এইসব দরিদ্র অনুন্নত দেশগুলিও, দেশ গঠনের অর্থ দেশরক্ষার খাতেই অধিক থেকে অধিকতর তোড়ে ব্যয়িত হচ্ছে। তাছাড়া গোপনেও মারাত্মক

অস্ত্রশস্ত্রের চোরা চালান চলেছে। কোথাও কোন অমানুষিক বর্বর হত্যাকাণ্ড হলেও পৃথিবীর দেশসমূহ বা রাষ্ট্রসংঘ থেকে কোন নিন্দাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না—ফলে জঘন্যতম খুনখারাবিগুলিকেও নির্বিবাদে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এই জাতীয় আভ্যন্তরীণ খুনী হস্তক্ষেপ। কোন একটি দেশ যদি তার প্রতিবাদ বা নিন্দা করতে যায়, তার প্রতিপক্ষ দেশ তক্ষুনি তার সুযোগ নেয়। এমন ধরণের ইম্‌মরাল রাজনৈতিক বাতাবরণ পৃথিবীতে কোন কালেই ছিল না, আজ স্বাধীন জনমত তো দূরের কথা, একটা স্বাধীন উক্তিও কোন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির মুখ থেকে আসে না। এ যে সভ্যতার পক্ষে কতবড় ভয়াবহ লক্ষণ এটুকু বুঝতেও কেউ চেষ্টা করে না। আমরা যেন সবাই—যা হবার হোক—বলে গা ছেড়ে বসে আছি—বসে আছি, অপেক্ষা করছি কিসের জন্য ? কেন আমাদের এমন অসহায় অবস্থা হলো ?

অনুন্নত দেশগুলির লোকসংখ্যা পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ। এই তিন চতুর্থাংশ দারিদ্রপীড়িত লোকগুলির সঙ্গে উন্নত দেশগুলির সংগ্রামটাই হলো আজকের প্রধান সংগ্রাম। অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির জন্য উন্নত দেশগুলির গ্রস-ন্যাশানাল-প্রোডাক্ট (G N P)র মাত্র ০·৮১ ভাগ সাহায্য দেওয়া হোক, এই প্রস্তাব করেছিল বিশ্বব্যাঙ্ক। সম্প্রতি বিশ্বসংস্থায় অনুন্নত দেশগুলি উন্নত দেশগুলির মোট আয়ের মাত্র ০·৭ শতাংশ দাবি করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলি তা সরাসরি অস্বীকার করে দিচ্ছে। আমেরিকা মাত্র ০·২ শতাংশ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। অথচ এসব দেশ তাদের দেশরক্ষা ও বিশ্বের রাজনীতিতে তৎপরতা রক্ষার বাবদ জাতীয় আয়ের অন্তত ত্রিশ ভাগ খরচ করে থাকে—কিন্তু পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়নের জন্য শতকরা এক ভাগও দিতে প্রস্তুত নয়। বুঝতে হবে তাই সবাইকে—সত্যিই লড়াইটা কোথায়।

এখন তাই বুঝতে হবে এই লড়াইটা হবে কী ভাবে। আমাদের এই দুরবস্থা ও অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত হবার উপায় কি উন্নত দেশগুলির দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করে ? কেন আমাদের এই অসহায় অবস্থা ? আসলে উন্নত দেশগুলিকে অনুকরণ করে যখন আমাদের মত

দরিদ্র দেশগুলিকে উন্নত করবার চেষ্টা করি তখন আমাদের এই বিপদজনক ফাঁদে পড়তেই হবে। ইয়োরোপ ও আমেরিকা এমন কি রাশিয়ার উন্নতমানের চাকচিক্যমান জীবনমান ও মূল্যবোধের দাস হয়ে যদি পড়ি —তবে আমাদের এই দুরবস্থা আসতে বাধ্য—এবং তাদের সঙ্গে লড়াই বা দরকষাকষি করার ক্ষমতাও সীমিত বা শূন্য হতে বাধ্য। তারা অর্থাৎ উন্নত দেশগুলি যে-সাহায্য করবে বা করে থাকে, তাতে কোনকালেই আমাদের দারিদ্র দূর হবে না, আত্মনির্ভরতা আসবে না। তারা এমন ধরণের সাহায্য করে থাকে, যার ফলশ্রুতি হয় আরও বেশী পরনির্ভরতা বা পরাধীনতা। এই ট্রিক্স্ বা অপকৌশলটা যদি আমরা ধরতে না পারি তবে আমাদের সর্বনাশ হবেই হবে। তারা যদি আজ ০·২ পার্সেণ্টের বদলে জাতীয় আয়ের ৫ পার্সেণ্ট সাহায্যও দেয়, তবু দেখা যাবে এমনভাবে সে-সাহায্যগুলি আসবে যাতে আমাদের মত দেশের সকলের উন্নতি হবে না, হবে মুষ্টিমেয় কিছু উপরতলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা দালাল শ্রেণীর লোকদের যাদের জীবনাদর্শ বা মূল্যবোধ খাঁটি ইয়োরোপীয়—ভোগবহুল, বিলাসবাদী, আত্মসর্বস্ব। এতে দেশের মধ্যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দলে দলে হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি বেড়েই যাবে, জনসাধারণের দারিদ্র কমবে না। অথচ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েই যাবে। অনুন্নত দেশগুলির একমাত্র বাঁচবার পথ, শান্তির পথে উন্নয়নের পথ হলো, সত্যিকার স্বদেশী ও স্বয়ংম্ভরতার পথ—এবং সে পথ আমাদের দেশে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের আদর্শের পথেই আছে, ইয়োরোপ আমেরিকার পথে নয়। আমাদের যা আছে— সেটাই আমাদের মূলধন, এই মূলধনও লোকশক্তির বিরাট সংযোজনের মধ্য দিয়ে আমরা বিরাট কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করতে যদি অগ্রসর হই—ভোগবিলাসের চাকচিক্যের মোহ পরিত্যাগ করে, তবেই আমরা সত্যিকার স্বাধীন সুখী স্বনির্ভর জাতিতে পরিণত হতে পারি, তবেই সত্যিকার বিশ্বশান্তির পথও খুলতে পারি। ইয়োরোপ, আমেরিকা ও এমনকি রাশিয়া যে ভোগাদর্শের ছবি উপস্থিত করছে তা তাদের নিজেদের দেশেও স্থায়ী করতে পারবে কিনা সে ভয় তাদের এসেছে। ফলে তারা কেউ অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধপ্রস্তুতির পথ থেকে অন্যদিকে যেতে পারছে না, পারবে না। তাদের

কাছ থেকে অহিংসা বা শান্তি আসতেই পারে না। তারা পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ নিজেদের জীবনমান রক্ষার জন্য কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করবেই। আমরা যদি তাদেরই অনুকরণে দেশের উন্নয়নের চেষ্টা করি, তা তো করতে পারবোই না, উপরন্তু দেশে একটা অনির্বাণ হিংসা, দ্বেষ, অশান্তির বাতাবরণ করে ফেলবো—এবং তার সুযোগ নেবে উন্নত দেশগুলিই।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রের নৈতিক মূলধন

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের আভ্যন্তরীণ মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন-গুলিরই আলোচনা হওয়া দরকার। দৈনন্দিন রাজনীতির বাইরে সামুহিক হিসেব নিকেশ বা সিংহাবলোকন বা টোটাল মূল্যায়ণের প্রয়োজন আজকের দিনে আর চিন্তাবিলাস নয়, থিওরির কচকচি নয়। মতবাদজনিত রাজনৈতিক চর্চা আজ কেবল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপার নয়। দেশের ও সমাজের গভীরতম অন্তঃস্থলেও আজ নানা বিক্ষোভ, আন্দোলন ও গুঞ্জন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। "টোটাল রেভল্যুসান"-এর আওয়াজ তুলে জয়প্রকাশ নারায়ণ এই প্রশ্নগুলিকে সর্বভারতীয় রণাঙ্গনে একটা "ব্যাটল অব আইডিয়াস"-এর বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। জয়প্রকাশ গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করছেন, সকল প্রকার অসন্তোষকে বেপরোয়া প্রকাশের সুযোগ দিয়ে সকল প্রকার প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে উস্কে দিচ্ছেন, ইত্যাদি অভিযোগ যা উঠেছে, তাতেও মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্থাপন আর না করা হোক, যেমন আছে তেমনি চলুক, এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে না। বহুদিন থেকেই দেশের নানা কোণ থেকে ছোট বড় নানা প্রশ্ন, সন্দেহ, তর্ক চলেছে, তা সৎ উদ্দেশ্য থেকেই হোক বা অসৎ উদ্দেশ্য থেকেই হোক। আজ যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে সব প্রশ্নগুলি সারা ভারতবর্ষেই উঠে থাকে, সেটা এক পক্ষে ভালই। জয়প্রকাশকেও যেমন দেশের লোকের কাছে তাঁর সততা বা বোনাফাইডি প্রমাণ করতে হবে, তেমনি অন্য পক্ষকেও, বস্তুত সব দল উপদল সবাইকেই। বস্তুত এ প্রশ্নগুলি শাসক-দল বা তার সমর্থনকারী দলগুলির মধ্যেও ওঠেনি, এ কথা তো ঠিক নয়। কংগ্রেসের মধ্যেও দুর্নীতি, অনাচার, কায়েমী স্বার্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তর সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা হয়। দলগুলির মধ্যে এত যে

ভাঙ্গা গড়া ও ফাটল দেখা দেয়, তাতেও এইসব প্রশ্ন উপস্থিত হয়। কাজেই এটাকে ইন্দিরা গান্ধী বা জয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বলে দেখা হাস্যকর। এটা আজ জাতীয় প্রশ্ন, জাতীয় আত্ম-জিজ্ঞাসা।

এই প্রশ্ন, তর্ক বা জিজ্ঞাসাতে আপামর জনসাধারণকে অংশ নিতে হবে। একটা বিরাট বিস্তৃত পাবলিক বা খোলা আলোচনা হওয়া দরকার—এবং সে জাতীয় আলোচনাতে সকলেই অংশ নিতে পারেন, যদি সেখানে হিংসা বা ভায়লেন্সের বাতাবরণ সৃষ্টি না হয়। সে ভায়লেন্স বিরুদ্ধ পক্ষ থেকেই হোক, আর সরকারের তরফ থেকেই হোক। উভয় দিক থেকেই হিংসা, ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার বর্জন করতে হবে।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রকে যদি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অনুসরণ করে চলতে হয়, তবে এই সার্বিক আলোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রকে হিংসা মুক্ত রাখতেই হবে। নির্বাচনে জয়ী হওয়াটাই গণতন্ত্রের একমাত্র মাপ-কাঠি নয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকেও আমরা দেখি যে যত রকম দাবিদাওয়া নিয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছিল, তার কেন্দ্রীয় দাবিটি ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তা ও প্রচারের স্বাধীনতা এবং মহাত্মা গান্ধীও এটাকেই অগ্রাধিকার দিতেন, তা নাহলে অহিংস গণআন্দোলনও সম্ভব নয়। অভয় বা নির্ভয়-এর উপরে তাঁর জোর দেওয়ার তাৎপর্যও ছিল এই।

প্রজাতন্ত্র দিবসে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মূল্যায়ণের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উভয় পক্ষই পরস্পরকে অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরতন্ত্রী বলে আক্রমণ করছেন। কিন্তু এই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের সোরগোলে জনসাধারণ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই কিছু না কিছু অভিযোগ যথার্থ বলে দেখানো শক্ত নয়। আমরা এভাবে অগ্রসর না হয়ে, গোটা কয়েক মৌলিক বা বেসিক মানদণ্ড উপস্থিত করতে চাই যা দিয়ে সকল পক্ষকে কিছুটা সহজে বিচার করা চলে।

১। গণতন্ত্রের একটা মৌলিক ভিত্তি হলো সকলের সমান অধিকার। এই সমান অধিকারের দাবিদাওয়া দেশে দিন দিন বাড়ছে বই কমছে

না। সমাজতন্ত্রের দাবীর মধ্যেও এই সমানাধিকারের কথাটা বর্তমান। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমানাধিকারের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমানাধিকারের একটা বিরোধ যেন দেখা যায়। রাজনৈতিক সমানাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক সমানাধিকারের স্বীকৃতি না মিলে, তবে উভয়বিধ গণতন্ত্রই অর্থহীন হয়ে পড়ে, অথবা পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ে।

২। প্রত্যেকেই আমরা সমান, কেবল এ কথাটার মধ্যেই গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক জাতীয়তা বা সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তা বা আন্তর্জাতীযতা সীমিত থাকতে পারে না। প্রত্যেকের সমানাধিকারটাই যদি বলি, অথচ সবাই মিলে আমরা এক, একথাটা বলতে যদি ভুলে যাই, তবে গণতন্ত্র আমাদের সকলকেই সর্বদাই বিচ্ছিন্ন ও একক করে দেবে। একে অপরের সমানাধিকার স্বীকার করতেই বা যাবে কেন? একে অপরের দুঃখ বুঝতেই বা যাবে কেন? কিন্তু যদি জানি আমরা সবাই মিলে এক, তবেই কেবল নিজের সমানাধিকারটাই নয়, অন্য সকলের সমানাধিকারের জন্যও তৎপর ও উদ্বিগ্ন থাকবো। অতএব কেবল সমানাধিকারের দাবি করলেই চলবে না, ঐক্যের কথাটাও ভুললে চলবে না।

৩। আবার ঐক্যের কথাটাই যদি বলি কিন্তু সমানাধিকারের কথাটা না বলি, তবে ঐক্যও হবে না, জাতীয় গণতান্ত্রিক ঐক্যও নয়, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ঐক্যও নয়। লক্ষপতির সঙ্গে দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি কখনও ঐক্য বোধ করতে পারে না। অতএব, প্রকৃত পক্ষে, সমানাধিকার ও ঐক্য পরস্পরের পরিপূরক, একটাকে বাদ দিযে অপরটা চালু হতে পারে না।

৪। এখানেই আসে দেশে সুখ ও দুঃখ সমানভাবে বেটে দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা। দেশের সকল ধন সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে দিলে, কেবল দারিদ্র বিতরণ করাই হবে, এই ধরণের যুক্তি অতি সরল বা সস্তা। দেশের সবাইকে কাজ কর্মে ও গঠনমূলক উদ্যমে যদি উৎসাহিত করে তুলতে হয়, তবে সেই কর্মযজ্ঞের ফল বা ফসলের সমানাধিকার আছে এটা দেখাতে হবে। নইলে চাবুক দিয়ে বা দারিদ্রের চাবুক দিয়ে জনসাধারণকে কর্মে উৎসাহী করে তোলা সম্ভব নয়। দারিদ্র বিতরণ

আমরা করব না, আমরা দেশে নানা ধরণের প্রকল্প স্থাপন করে দেশের শক্তি ও সঙ্গতি বাড়িয়ে নেবো, তার ফলে নীচের তলায় সবাই কাজ কর্ম ও সুবিধা পাবে, এই ধরণের আশা আজ দেশে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া মুষ্টিমেয় লোক বিলাস ব্যসনে দিন কাটাবে, আর বাকী সবাই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও সাধারণ অন্নবস্ত্র যোগাতে পারবে না, এমন ধরণের অবস্থায় সমানাধিকার ও ঐক্য কোনটারই কোন সত্য মুল্য থাকতে পারে না।

৫। ভোগের নিয়ন্ত্রণ, কনজামসান কণ্ট্রোলের প্রয়োজন এই জন্যই অনুভূত হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী খসড়া পরিকল্পনাতেও এই ভোগ্যমানের নিয়ন্ত্রণের কথা লেখা আছে, কিন্তু তা অন্যান্য সদিচ্ছার মধ্যে অন্যতম মাত্র, অর্থাৎ কার্যত উপেক্ষিত। "মোটা ভাত মোটা কাপড়"-এর মানদণ্ডটাই আমাদের দেশের মত জনবহুল দরিদ্র দেশের লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, একথাটা কি আমরা মনে প্রাণে স্বীকার করি? জাম্বু জেট বিমান নয়, সামরিক বিমান বহর ছাড়া, অন্য কোন সিভিল এয়ার লাইনসের আমাদের দরকার নেই, প্রাইভেট মোটর গাড়ী নয়, অধিক সংখ্যায় বাস এবং সকল কর্মক্ষম লোককে একটা করে সাইকেল দিতে হবে, এ জাতীয় যুক্তি কোন রাজনৈতিক দল মেনে নিয়েছেন? কোন্ স্টাণ্ডার্ড অফ-লাইফ বা জীবন যাত্রার মান আমরা দেশের সামনে রেখেছি? আমরা কি পৃথিবীতে আরও একটা আমেরিকা হবে, হতে পারে, বলে মনে করি? আমেরিকা কি নিজেই তার জীবনমান রক্ষা করতে হিমসিম হচ্ছে না? তবে কেন আমরা ইয়োরোপ আমেরিকান জীবনমানের স্বর্ণমৃগের পিছনে সকলকে ছোটাতে চাই?

৬। দুর্নীতির জন্মই হলো আয়ের চেয়ে ব্যয়ের বহর বাড়ানোতে, সাধ্যের চেয়ে সাধকে বড় করে দেখতে ও দেখাতে। আমাদের যা সঙ্গতি বা রিসোর্স তার উপরে নির্ভর করেই আমাদের জীবনমান ও প্ল্যানিং করতে হবে। তাতে আগামী ২০ বছরের জন্য দেশের সবাইকে "মোটা ভাত মোটা কাপড়"-এর সীমানাতেই থাকতে হবে বলে পরিষ্কার বলে দিতে হবে—সবার জন্য, কেবল গরীবদের জন্যই নয়। এই গরিবী বা দারিদ্র যখন সবারই উপর সমানভাবে পড়বে, তখন সবাই মিলে সত্যি সত্যি দারিদ্রের বিরুদ্ধে একটা সামগ্রিক অভিযান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

নইলে গরিবী হটানোটা একটা পোষাকী কথা, কথার কথা বা হাস্যকর কথা হয়ে দাঁড়াবে মাত্র।

৭। উপরোক্ত লক্ষ্য যদি বাস্তবে কায়েম করতে হয, তবে বেশীর ভাগ মানুষ—দেশের শতকরা আশীটা লোক যেখানে বাস করে—অর্থাৎ ভারতের গ্রামদেশের উপরে শতকরা আশী ভাগে নজর দিতে হবে। ভারতের বৃহৎ শিল্প ও সহর নগর বন্দর কলকারখানা ইত্যাদিকে গ্রাম ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্য নিয়োজিত করতে হবে, কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে সত্যিকার পরিপূরক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এ পথে অগ্রসর হলে আমাদের বিপুল জনসাধারণের সবাইকে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব।

উপরে যে সাত দফা কর্মসূচী দৃষ্টিভঙ্গী দেওয়া হলো, এর মাপকাঠিতে বা কষ্টিপাথরে বিচার করতে হবে কোন্ দলের কী মতলব বা লক্ষ্য বা আদর্শ। নইলে এলোমেলো কথার উপরে বিশ্বাস রাখা সম্ভব নয়। ভারতীয় সমাজতন্ত্র ভারতীয় পরিস্থিতির উপরেই দাঁড় করানো সম্ভব। ভারতের জনসংখ্যা এই শতাব্দীর শেষে একশত কোটিতে এসে দাঁড়াবে। এই একশত কোটি লোককে মোটামুটি খাওয়া পরা ভারত সেদিন যদি দিতে চায়, তবে তাকে সমাজতন্ত্রের পথ ধরতেই হবে, ব্যক্তিগত ও অঞ্চলগত বৈষম্য দূর করতেই হবে এবং যত বড় বা বিপুল একটা কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করলে তা করা সম্ভব তা একমাত্র জনসাধারণের অকুণ্ঠ, সক্রিয় সহযোগিতা থেকেই আসতে পারে। এ কেবল ন্যায় বিচারের কথাই নয়, নিছক বাস্তব উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের স্বার্থেই।

কিন্তু আজকের দল উপদলগুলি সবাই মোটামুটিভাবে ভোগবাদী। জনতাকে কে কত ভোগের সামগ্রী ও সুখ দেবেন এই নিয়ে যে প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে আছে, তাতে তাদের সততা প্রমাণ হয় না, কেননা তাদের দলবলের চরিত্র মধ্যবিত্ত সুলভ, ব্যক্তিগত জীবনে তারা প্রায় সবাই পরশ্রমজীবী, কায়িক-কর্মবিমুখ, সুখান্বেষী ও স্বার্থপর। উপরোক্ত কর্মকাণ্ড প্রচার করার সাহস তাদের এখনও আসে নি, কারণ প্রথম এ জাতীয় লক্ষ্য বা কর্মপন্থা প্রথমে নিজেদেরকেই আঘাত করবে, দ্বিতীয়ত ভোটের স্বার্থে নির্বাচনের সময় এইসব রাজনীতিকেরা কখনও

কঠোর সত্য কথাটা বলবে না, মুখরোচক শ্রুতি মধুর প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিতে থাকবে, যে প্রতিশ্রুতি তারা নিজেরাও পালন করতে পারবেন না তারা মনে মনে জানলেও। কিন্তু আজ জনসাধারণকে একথা বুঝতে হবে, তাদেরকে সর্বপ্রকার মোহমুক্ত হতে হবে, মধ্যবিত্ত সুলভ অবাস্তব স্বর্ণমৃগের স্বপ্ন থেকে মুক্ত হতে হবে। এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী না নিয়ে নির্বাচনে নামলে দলগুলিকে সুবিধাবাদী মোর্চা করতেই হবে, ষ্ট্রেঞ্জ বেড ফেলো নিতেই হবে সর্ব দল বা মোর্চাকে।

দৃষ্টিভঙ্গীর একটা সামগ্রিক পরিবর্তন ছাড়া ভারতের মত দেশে সত্যিকার সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। একে টোটাল রেভল্যুসান বলুন, কালচারাল রেভল্যুসানই বলুন, নতুন জীবনবাদই বলুন, যে যা খুশী নাম দিন; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটিকে অস্বীকার করে, এই নৈতিক মূলধনকে অস্বীকার করে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের যাবতীয় অর্থ এদেশে ঢেলেও আমাদের দেশের দারিদ্র দূর করা যাবে না, বৈষম্য দূর করা যাবে না, গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যাবে না—সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা।

সমাজগঠনে সুন্দরের ভূমিকা

গ্রামদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রোগ্রাম আজ আমাদের রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হতে চলেছে, অন্তত এ জাতীয় এলাকাভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত হয়েছে। কোন জমি, কারো জমি এবং কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়ে পুনর্গঠনের দাবি উঠেছে। ভূমিহীন চাষী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, পিছিয়ে-পড়া উপজাতি—যারা আজ গ্রামদেশে শতকরা পঁচাত্তর জন, তাদের উপরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হতে হবে—এজাতীয় নির্দেশ উপর থেকে ক্রমাগত আসছে। বাস্তবক্ষেত্রে এ নির্দেশ কী উপায়ে কার্যকর করা যাবে এ নিয়ে অবশ্য অনেক দুর্ভাবনা আছে।

যাই হোক, গ্রামের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র-সেচ প্রকল্প এগিয়ে চলেছে। গভীর ও অগভীর নলকূপ, রিভার লিফ্‌ট, পুকুরের সংস্কার ইত্যাদি কাজ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ব্যাংক, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদির মারফৎ মূলধন পৌঁছে দেবার চেষ্টা চলছে। গ্রাম-সেবকদের মূলত কৃষি সম্প্রসারণের কাজে অধিকতর আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ গেছে। উপরন্তু এস-এফ-ডি-এ, সি-এ-ডি-পি, সি-এ-ডি-এ, ল্যাম্প জাতীয় এরিয়া-ভিত্তিক উদ্যমও রয়েছে। মোটকথা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ-আয়োজনটাই স্পষ্ট। এবিষয়ে সন্দেহ নাই, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন দিয়েই কাজটা সুরু করতে হবে, অর্থ নৈতিক উন্নতির ভিতের উপরেই অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভরশীল।

কিন্তু এইসব অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীর একটা দুর্বলদিকও আছে, সেসম্বন্ধে প্রথম থেকেই সজাগ না থাকলে শিব গড়তে বানর হয়ে যেতে পারে। প্রথমত সেচ, মূলধন, ভাল বীজ, গুদাম, ইত্যাদি উপাদান বা

যোগানসমূহ তারাই নিতে পারে, যাদের কিছু না কিছু জমি-জেরাত আছে, সম্পত্তি আছে। অথচ আজ আমাদের দেশে শতকরা চল্লিশজনই ভূমিহীন, তারা এসবের কোন প্রত্যক্ষ সুবিধা নিতে পারে না। অবশ্য সারা বছর যদি সব জমিতে চাষবাস হয়, তবে তাদের মজুর হিসেবে খাটবার ও মজুরির হারবৃদ্ধির একটা সুবিধা হয়তো মিলতে পারে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অবস্থাও এত খারাপ যে সেচ-বীজ-মূলধন পেয়ে তাদের নিজ নিজ জমি থেকে অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম হলেও সহজে তাদের সকল অভাব দূর হয় না। দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো, যাদের জমি-জেরাত আছে বা কিছু সম্পত্তি আছে তারা সেচ ও ব্যাংকের সুবিধা পেয়ে উন্নতি করতে পারছে বটে, কিন্তু সে উন্নয়নের ধরণটি হলো ব্যক্তিগত উন্নতির পথ। সকলকে নিয়ে চলার কোন বাধ্যবাধকতা বা উৎসাহ না থাকার ফলে, যার-যারটা তার-তার ব্যাপার হয়ে আছে। সামগ্রিক উন্নয়নের প্রকল্প উপস্থিত করলেও, ব্যক্তিবাদী বা আত্মসর্বস্ব মনোভাব জোরদার হচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যোগের মধ্যে একধরণের স্বার্থান্বেষী বা আত্মসর্বস্ব মনোভাব জোরদার হচ্ছে। হয়তো তাদের পাকা দালান হচ্ছে, দুতলা বাড়ীও উঠছে, কিন্তু সংগে সংগে গ্রামদেশেও একধরণের বস্তি বা স্লামের জন্ম হচ্ছে। নিজের পাকা দালানের পাশ দিয়েই যে গ্রাম্য রাস্তাটি গেছে, তার দিকে অট্টালিকার বাসিন্দারও কোন নজর নেই, উপরন্তু গ্রাম্য রাস্তাটিকে যে যতটা পারে গ্রাস করে নিচ্ছে। ঘরের ভিতরটা তাদের যত সুন্দরই হোক, গ্রামটির কোন শ্রী নেই, সৌন্দর্য নেই। অনেক ক্ষেত্রেই নাকে কাপড় দিয়েও গ্রামের মধ্যে ঢুকতে হয়। যথা-তথা গোবরের টাল জমে আছে, রাস্তা ও নর্দমা একই কাজ করছে, মলমুত্র ত্যাগ করার কোন নিয়ম কানুন নেই, পুকুরের ধারে যাওয়া চলে না। গাছ-গাছড়া নতুন করে আর লাগানো হয় না, ফুলের গাছ কদাচিৎ নজরে পড়ে। রাস্তাঘাটের অবস্থা অবর্ণনীয়, গ্রাম্য স্কুলটির চেহারা সব চেয়ে খারাপ। গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতে কোন অর্থ নেই, অর্থসংগ্রহ করার ক্ষমতাও তার সামান্য। স্বেচ্ছাশ্রমই বা কে দিতে পারে, যেখানে ব্যক্তিগত উন্নতি ভিন্ন অন্যকোন সামাজিক ইনসেনটিভ বা প্রেরণা নেই।

আমরা মনে করি গ্রামদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রোগ্রামের মধ্যে গ্রামটিকে সুন্দর করতে হবে, এজাতীয় প্রোগ্রামও বেশ জোরদার করে চালু করা দরকার। সুন্দর কথাটি সামান্য নয়। ধর্মীয় শাস্ত্রে ভগবানের রূপ সত্য, শিব ও সুন্দর বলেও কথিত আছে। ব্যবহারিক জীবনেও আমরা সুন্দরের জন্য বা সৌন্দর্যের জন্য কম খরচ করি না। সুন্দর জামা-কাপড়, সুন্দর রূপের সাধনা, সুন্দর ঘরবাড়ী, সুন্দর বৈঠকখানা—এসব যদি খতিয়ে দেখি তবে বুঝতে অসুবিধা হবে না স্রেফ সৌন্দর্যের জন্য আমাদের পারিবারিক বাজেট কতটা দখল করে আছে—বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত। যারা নিম্নবিত্ত, এমনকি খুব নীচের তলাকার লোক, তাদের মধ্যেও একটা রূপ-তৃষ্ণা আছে, যদিও আর্থিক দুর্গতির জন্য তারা নোংরা থাকতে বাধ্য হয়। প্রচণ্ড দারিদ্র দিন-আনি-দিন-খাই যেসব সাঁওতাল আছে, তাদের মধ্যে আজও সুন্দরের ও সুশ্রীর সাধনা দেখা যায়।

কিন্তু এই সৌন্দর্যের সাধনা বা নন্দনতত্ত্বের প্রধান অন্তরায় হলো আজকের এই আত্মসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগীর অবাধ প্রচলন। স্বার্থপরতার সংগে সৌন্দর্য সত্যিই খাপ খায় না। সমগ্র গ্রামখানির সর্বাঙ্গীণ শ্রীর প্রধান বাধা হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত লোভ ও ঈর্ষা। সামাজিক ও সামগ্রিক দায়িত্ববোধের যত অভাব হচ্ছে, গ্রামীণ সৌন্দর্যেরও তত অভাব হচ্ছে। ইস্‌থেটিকস্‌-এর সঙ্গে এথিক্‌সের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে, যেমন আছে ব্যক্তিগত এথিক্‌সের সংগে সোসাল এথিক্‌সের সম্পর্ক। কথায় বলে আপ রুচি খানা, আর পর রুচি পহ্‌রনা। রুচিটা তাই পরনির্ভর। অর্থাৎ অন্যরা দেখুক, এবং তারা দেখে খুশি হতে পারে যদি তবেই সুন্দর হলো। সৌন্দর্য তাই সামাজিক স্বীকৃতির উপর এতটা নির্ভরশীল। নিজের আয়নার সামনে আমাকে সুন্দর দেখলেই কিছু হলো না, অন্যরা আমাকে সুন্দর দেখছে কিনা সেটাই বড় কথা। অন্যদের যদি অবহেলা করি, ঘৃণা করি, তুচ্ছ করি, তবে চেহারাতে আমি যত সুন্দরই হই না, অন্যের কাছে তা ধরা দেবে কুৎসিত বলে, লোকে আমাকে এড়িয়ে চলবে, নিন্দেই করবে, প্রশংসা করবে না। সৌন্দর্য তাই একটা সামাজিক-বোধ বা প্রত্যয়। সমাজেই তার স্থান ও মূল্য, বনে-জঙ্গলে

বা পর্বতগুহায় নয়। অতএব সৌন্দর্যের জন্য ব্যক্তিগত সাধনা বা প্রেরণার ফলশ্রুতি হতে হয় তার বিপরীত—মানে কুৎসিত।

সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রোগ্রামে তাই প্রথম থেকেই গ্রামটির সর্বাঙ্গীণ শ্রী ফিরিয়ে আনার দিকে জোর দেওয়া উচিত। এতে সকলের অংশ-গ্রহণ করানো বা mass participation করানো সম্ভব। গ্রামের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখা, ময়লা আবর্জনা দূর করা, দরিদ্রতম ব্যক্তির কুটির-খানাও একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া, রাস্তার পাশে পাশে গাছ গাছড়া লাগানো, দু-চারটা ফুলের গাছ সবারই অঙ্গনে লাগানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, খানাখন্দ গর্তগুলিকে বুজিয়ে দেওয়া, পুকুরগুলিকে সংস্কার করে তা সুন্দর করে রাখা ইত্যাদি কাজগুলি হয়তো ব্যাঙ্কেবেল প্রজেক্ট নয়। কিন্তু এগুলি যদি করা সম্ভব হয় তবে সমাজজীবনের যে একটি অতি-আবশ্যিক অপরিহার্য সুন্দর বাতাবরণের প্রয়োজন—তাই শুধু মিটবে না, অর্থনৈতিক উন্নতির একটা সুস্থ পরিবেশও তৈরী হবে, এবং সেক্ষেত্রেও সহযোগিতার—অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে ছন্দোবদ্ধ উপায়ে অগ্রসর হবার পথ প্রশস্ত হবে। অর্থনীতিও স্বার্থদুষ্ট হবে না, একের উন্নতি অপরের অবনতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

সৌন্দর্যবোধ সামগ্রিকভাবে মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, কুৎসিত আচরণে লজ্জা দেয়, সামাজিক দায়িত্ববোধ বাড়ায়। এই সহজ কথাটিকে ভুলে গেলে, অর্থাৎ সুন্দরকে যদি আমরা অবহেলা করি তবে সত্য ও শিবকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা শক্ত হবে। সুন্দরের সীমা নেই, সুন্দর কখনো ক্ষুদ্রচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। একদিকে মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তার একটা ছন্দোময় সম্পর্ক, অপর দিকে মানুষে মানুষে ভালবাসার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ঘটে থাকে। এমনকি সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেও শেষ পর্যন্ত যা সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে পারে—তাও সুন্দরেরই সঙ্গে সত্যের মিলনভূমিতে।

আরও একটা দিক আছে সুন্দরের বিকাশের পথে, সে হোলো আনন্দের সাধনা। আজকের নিরানন্দময় গ্রামগুলিতে প্রাণের জোয়ার আনতে হলে আনন্দের আয়োজনও করতে হবে, যে-সব আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে সুন্দরের মাত্রা ও শক্তিমান ছন্দ ও গতি আছে, আর আছে

সকলের অংশ গ্রহণ বা পারটিসিপেশন। লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, খেলাধূলা ইত্যাদি মানুষকে তার আশু-ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি দেয়। আমরা দেখছি যে কোন একটি অনুষ্ঠানে কীভাবে শিশু, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী—জাতপাত ধর্ম নির্বিশেষে ভেঙ্গে পড়ে। এই অনুষ্ঠানে জাত-পাতের ও শ্রেণীর বিভাগগুলি ভেঙ্গে যেতে চায়—বিশেষ করে আজকের গ্রামদেশের যেখানে অসংখ্য ছেলেপিলের দল বন্যার মত এসে পড়েছে। এই বন্যাকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই, উচিতও নয়। এই লোকবন্যাই একদিন পুরাতন সামাজিক বাধাবন্ধনকে ভেঙ্গে দিতে পারে—ভাঙ্গছেও। কিন্তু এই বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার, সামাজিক চেতনা, সুন্দর ও ছন্দময় সুশৃঙ্খল আনন্দের ধারামুখ সৃষ্টি করে। এই বন্যাকে তখন গঠন-মূলক কাজের দিকে ধাবমান করাও হয়তো সম্ভব।

এই অসন্তোষ

একটা অভিযোগ আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে আগের দিনের মত আজকাল আনুগত্য বা বিশ্বাসের বাতাবরণ নেই। দল, মত, নেতা, মতাদর্শ বা ইডিওলজি সবই আছে, কিন্তু তাদের প্রতি সত্যিকার আনুগত্য নেই। দল, নেতা, মতবাদ ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু সে কেবল স্নবিধার খাতিরে। হয়তো এমন দল বা নেতার বা নেতৃত্বের অনুসরণ করে চলছি, যাদের প্রতি সত্যিকার আস্থা বা শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু যূথবদ্ধ হয়ে না থাকলে বাঁচা যায় না, বা অভীষ্ট লক্ষ্য করায়ত্ত হয় না, স্রেফ এই কারণেই আছি। তাতে নিজের দলের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে অন্যান্য দল বা নেতৃত্বকে হীন প্রমাণিত করতে উৎসাহ বেশী হয়। আমার চেয়ে অন্যেরা খারাপ এটা প্রমাণ করার মধ্যেই যেন আমার সত্যমূল্য নির্ধারিত হয়!

যাই হোক, এই লক্ষণটি কেবল আমাদের দেশ বা সমাজেরই নয়, অল্পবিস্তর পৃথিবীর চেহারাটাই আজ প্রায় এরকম—বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে, উন্নত ও অনুন্নত, যাই হোক না কেন। সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেছেন এই কথাই—যখন তারা বলেন যে Credibility Gapটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বাস ও আনুগত্যের সূত্রটা দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর ও শেষ পর্যন্ত ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ এটাকে আবার "জেনারেশন গ্যাপ"—অর্থাৎ পরবর্তী পুরুষ বা জেনারেশনের সঙ্গে ছেদ ঘটে যাচ্ছে অগ্রবর্তী পুরুষের সঙ্গে বলেও আরোপ করছেন। কিন্তু ক্রেডিবিলিটি গ্যাপ ও জেনারেশন গ্যাপ এক কথা নয়। একই জেনারেশনের মধ্যেও পরস্পরের উপরে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দিন দিন বাড়ছে। মোট কথা এই, কোথাও জনশক্তি বেশ দানা বেঁধে উঠছে না, স্নবিধাবাদী মোর্চা হয়তো হচ্ছে, কিন্তু

ইন্টিগ্রেটেড কোন mass-personality, কোন মতাদর্শের ভিত্তিতে, দানা বেঁধে উঠতে উঠতেই, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কোথায় যেন একটা disintegration বা ছিন্ন-ভিন্ন টুকরো-টাকরা হয়ে যাবার বীজ কে বুনে যাচ্ছে, যে বীজের অঙ্কুরগুলি যেন অমর, মেরে শেষ করা যায় না। মানুষে মানুষে ঐক্যের সূত্রটা কোথায় তা যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না। এর ফলে কী হচ্ছে? কোন প্রোগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত mass participation বা জনসমর্থন, জনসংযোগ বা জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হতে চায় না।

অতীতে নেতা বা নেতৃত্বের পিছনে যে সরল সহযোগিতা বা উষ্ণ আনুগত্য মিলতো তা আজ আর নেই। সে রকম নেতা নেই, সে ধরণের অকৃত্রিম নেতৃত্ব মিলে না, কাজেই সে রকম সরল গণ-আনুগত্যও মিলে না, এ ধরণের যুক্তি খুবই অতি সরল। আসল প্রশ্ন হলো, আমরা সত্যিই আজকাল তেমন নেতা চাই কিনা, নেতৃত্ব মানতে চাই কিনা অথবা সত্যি সত্যিই জীবনে এমন কোন মতাদর্শ বা ইডিওলজি চাই কিনা যার আদেশে সর্বস্ব সমর্পণ করে চলতে প্রস্তুত। যদি তা না চাই, যদি নিজেদের মনোবৃত্তির মধ্যে একটা built-in reservation থাকে অর্থাৎ 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'তে মন সাড়া না দেয়, বা নেতাকে এতটুকুর জন্য অনুসরণ করবো, বাকীটার বেলায় নিজের একান্ত স্বার্থটুকু রক্ষা করেই চলবো, একটা লিমিটেড লায়েবিলিটির লয়ালিটিটুকু থাকে মাত্র, তবে আমাদের মধ্যে নেতানুগত্য বা মতানুগত্য বৃদ্ধি পেতেই পারে না। নেতা বা মতাদর্শটা ভাল নেই বলেই নেতা বা মতাদর্শকে মানছি না, এমন না-ও হতে পারে, চাই না বলেই নেতা পাই না এমনও হতে পারে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব চিরকালই ছিল, কিন্তু চিরকাল এই পরস্পর বিরোধী ভাবধারার শক্তি-সাম্য বা ব্যালেন্স এক রকম ছিল না। যত সরলতার বা সরলবিশ্বাসের যুগ থেকে Sophistication-এর যুগে এসে পড়ছি, ততই এই যূথবদ্ধ সামাজিক সত্তার দিকটা দুর্বল হচ্ছে এবং ব্যক্তিবাদী ও ব্যক্তিসর্বস্ব চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রটা বাড়ছে। এই Sophistication-এর লক্ষণ কি কি? Critical ও Cynical হওয়াটাই এই Sophistication-এর মূল শক্তি। সমস্ত

ব্যাপারেই সন্দেহবাদী হওয়া ও nonconformist হয়ে সব কিছুকে না মেনে নিয়ে প্রশ্ন করা, এটা হলো এই সফিস্টিকেশন যুগের ধর্ম।

শিক্ষার বিস্তার যত হচ্ছে, তত এই critical দৃষ্টিভঙ্গীরও বিস্তার ঘটছে। তবে কি বলতে হবে যে শিক্ষার বিস্তারের ফলেই যদি মানুষের প্রতি মানুষের, দলের প্রতি দলীয়দের, নেতার প্রতি জনতার আনুগত্য কমতেই থাকে—যার ফলে স্বার্থবুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ে দেশের ও সমাজের কাজ করানো সম্ভব নয়, তবে কি শিক্ষার মূল লক্ষ্যটাই ব্যর্থ হলো না? তবে কী হলো শিক্ষার বিস্তার করে? কিন্তু শিক্ষাটা এরকম না হয়ে, সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমেরও হতে পারতো—যেখানে শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থের উপরে জোর দেওয়া। তা হলে হয়তো ফলটা অন্যরকম হতো। কিন্তু এই ধরণের চিন্তাভাবনা ব্যক্তিস্বার্থবাদের স্তূপে চাপা পড়ে গেছে।

এখানে, এই নিবন্ধে, কী এখন হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে সেটুকুই বোঝবার চেষ্টা করি। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানাগার এই কয়েক বছরের মধ্যে কতগুণ বেড়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ গ্রাজুয়েট বের হয়ে আসছে প্রতি বছর। নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা বেড়ে গেলেও. মোট শিক্ষিতের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। এই শিক্ষিতদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো ব্যক্তিবাদী, ব্যক্তিসর্বস্ব। এদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার কোন সম্পর্ক না থাকার মানে এই নয় যে, তাঁদের চক্ষে কোন স্বপ্ন ছিল না বা লক্ষ্য ছিল না বা নেই। লক্ষ্যহীন শূন্যতার মধ্যে তাঁরা শিক্ষিত হননি। তাঁরা বড়লোক হবেন, প্রচুর গাড়ী বাড়ী ধন দৌলত করতে পারবেন, অন্যদের প্রাণে ঈর্ষা জাগিয়ে নিজেদের জাঁকজমক ঠাটবাট দেখাতে পারবেন—এ হলো তাদের জীবনাদর্শ। এই ভোগবাদী জীবনের কোন সীমা নেই। শুনতে ভাল শোনায় যে তাঁরা হলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারক ও বাহক, যে-শ্রেণী সমাজের মূক অসন্তোষকে মুখর করে তোলে, আদর্শ সৃষ্টি করে, কৃষ্টি কলা, শিক্ষা দীক্ষার নেতৃত্ব করে বলে দাবি করা হয়। তাঁরাই যেন আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তাঁরা উচ্চবিত্ত নন, কেননা সকলে উচ্চবিত্ত হতে পারে না, মুষ্টিমেয়ই পারে। কিন্তু পারে না বলেই তাঁদের মনে ক্ষোভেরও

অন্ত থাকে না। মধ্যবিত্তকে কখনও সন্তুষ্ট করা যায় না, মধ্যবিত্তের প্রাণেই রয়েছে এক অসন্তোষের অনির্বাণ উৎস। তাঁরা যা চান তা পাচ্ছেন না বলে, তাঁরা নিজেরা যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি সবাইকে দলে টানবার জন্য অসন্তোষ ছড়িয়ে চলছেন।

যারা নিম্নবিত্ত, গরীব, দুবেলা পেট ভরে যারা খেতে পায় না—তাদের অসন্তোষ ও মধ্যবিত্তদের অসন্তোষ এক জাতীয় নয়। জীবনধারণের প্রয়োজনে নিম্নতম চাহিদা মেটাবার জন্য গরীবের অসন্তোষ ও মধ্যবিত্তের অহমিকার ক্ষুধার প্রয়োজনে যে অসন্তোষ, এ দুটো আলাদা জাতের। কিন্তু গোলেমালে সব অসন্তোষকেই একাকার করে ফেলা হয়। যদি একটু তলিয়ে দেখা যায় তবে হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এই দুই শ্রেণীর অসন্তোষ একই পথে মেটানো সম্ভব নয়, বরং গরীবের মোটা ভাত মোটা কাপড় ইত্যাদি সামান্য প্রয়োজনগুলি মেটাতে গেলেও মধ্যবিত্তদের স্বপ্নপুরীতে আগুন লাগাতে হয়। আবার মধ্যবিত্তদের বর্তমান ক্ষুধার আগুন যেভাবে বেড়ে চলেছে—উচ্চবিত্তদের ও পশ্চিমী ভোগ-বিলাসের বহর দেখে—তাতে নিম্নবিত্তদের বঞ্চিত না করে তা মেটানো সম্ভব নয়। তথাপি নিম্নবিত্তরাও মধ্যবিত্তদের অসন্তোষের সঙ্গে নিজেদের অসন্তোষ মিলাতে গিয়ে তারাও বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারাও মধ্যবিত্তদের স্বপ্নের মুকুরে নিজেদের মুখ দেখতে গিয়ে এক বিজাতীয় মোহে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ছে—বিশেষ করে তাদের ছেলেমেয়েরা যারা মধ্যবিত্তচালিত স্কুলে কিঞ্চিৎ পঠন-পাঠনের সুযোগ পাচ্ছে। যার ফলে চাষীর ছেলেও আর চাষ করতে চায় না, শ্রমিকের ছেলে-মেয়েরাও কায়িক শ্রমকে ও হাতের কাজকে ঘৃণা করতে চায়—সবাই বাবু বা হোয়াইট কলার বৃত্তি চায়। মোট কথা স্কুল-কলেজ শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তারের ফলে সন্তোষ আসছে না, বাড়ছে অসন্তোষ।

কিন্তু সে অসন্তোষই সুস্থ—যাতে সামাজিক দায়িত্ববোধ লোপ পায় না, অথচ যে অসন্তোষ মেটানো যায়। এখন যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তার মধ্যে যেমন নিজেরটি ছাড়া অন্যদের জন্য ভাবনা নেই, তেমনি বাস্তব-ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই কোটি কোটি উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের ব্যক্তিগত চাহিদাও নানা কারণে মিটছে না। ফলে অসন্তোষ এখানে উদ্যোগ ও উদ্যমের

ইন্ধন না হয়ে শেষ পর্যন্ত আশাভঙ্গ বা ফ্রাসট্রেশানে পরিণত হচ্ছে। আশাভঙ্গ থেকে যে অসন্তোষ—সেটা আরও মারাত্মক, কেননা তাতে বুর্জোয়া-আশাবাদও পরাস্ত হচ্ছে—ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরণের নৈরাশ্যবাদ ও সিনিসিজ্‌ম। এই নৈরাশ্যবাদ ও সিনিসিজ্‌ম থেকে যে ধরণের রুগ্ন-বিদগ্ধতা বা মরবিড সফিস্টিকেশন স্থষ্টি হয়, তাতে কারো প্রতিই আর বিশ্বাস, আস্থা বা আনুগত্য থাকে না। Credibility gapটা বেড়েই যেতে থাকে।

সর্বব্যাপী এই অসন্তোষটার একটা ধারালো বিশ্লেষণ দরকার। যারা মনে করেন এই অসন্তোষই উন্নতির ইন্ধন বা incentive তারা ভুল করছেন। এই অসন্তোষের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই। এ কেবল ভোগের ভাগ নিয়ে ঝগড়া ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। এর মধ্যে কোন সামাজিক দায়-দায়িত্ববোধ নেই, কেবল আছে নিজেরটা কি করে গুছিয়ে নেওয়া যায়। এই অসন্তোষে কোন গুণগত রূপান্তর ঘটে না—চিন্তা ও চেতনায়। এই অন্ধ আকুতিতে কোন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার স্রোতও মুক্ত হয না, কোন নতুন চিন্তা-ভাবনাও আসে না। মানুষের দৃষ্টি এতে আচ্ছন্ন করে, কেবল ধোঁয়া স্থষ্টি হয়, আগুন স্থষ্টি করে না, আলোতো নয়ই। যেখানেই ধোঁয়া, সেখানেই আগুন আছে, এই শাস্ত্রোক্তির মধ্যেও ত্রুটি আছে। কেননা আগুনটা কী জাতীয় তাও খতিয়ে দেখতে হবে। এ কেবলই আত্মঘাতী উত্তাপ, পরস্পর বিরোধী কোন্দল। এর মধ্যে শ্রেণী-চেতনাও নেই, সমাজ চেতনাতো দূরের কথা। কোন শোষিত বা বঞ্চিত শ্রেণীকেও এই আগুনে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। এতে নেতৃত্বও স্থষ্টি হয় না, বরং যতটুকুও বা সংগঠন বা নেতৃত্ব গড়ে উঠতে চায় তা পরমুহূর্তেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কেউ নেতাও চায় না, কেননা সত্যিকার নেতা তার অনুগামীদের কাছে পদে পদে নানা ধরণের আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের দাবি করে থাকে। কিন্তু আজকালকার ক্ষণস্থায়ী নেতৃত্ব কারো কাছে কোন দুঃখ-কষ্ট বরণের দাবি করতে সাহস পান না, কেননা তাতে দল ভেঙ্গে যাবে। আমরা নেতা পাই না কেননা নেতা স্থষ্টি করতে চাই না, ফলে নেতা আসবে কোথা থেকে। যদি সত্যিই চাইতাম, যদি necessity-বোধ তীব্র হোতো,

তবে যে কোন মাটির মানুষকেই নেতা বানিযে ছাড়তাম। আমরা কি মাটির পুতুলকেও দেবতা বানিয়ে ছাড়ি না? এমন credibility gap সৃষ্টি হোতো না। এমন নেতি-বাদী বাতাবরণ সৃষ্টি হোতো না। লক্ষ লক্ষ চোর যদি মনে করে একটা সৎ জিনিষ গড়বো, তা কি কখনও সম্ভব? কোটি কোটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থ মিলিযে একটা দেশাত্মবোধক সামাজিক উদ্দীপনা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, যেমন লক্ষ লক্ষ মিথ্যাকে একত্র করে সত্যের একটি দানাও সৃষ্টি করা সম্ভব নয।

সমস্যাটির ব্যাপকতা ও গভীরতা অসীম, সারা পৃথিবীব্যাপী মানুষের কাছে এই বৃহৎ সমস্যাটি উপস্থিত। উন্নযনশীল ও উন্নত, সবদেশেই এই সমস্যা উপস্থিত। এর কোন সহজ উত্তর নেই। আমাদের চিন্তা-চেতনায় একটা আমূল পরিবর্তন দরকার। কাজটি সহজ নয, অভ্যস্ত সংস্কারকে ত্যাগ করা কঠিনতম কাজ। কঠিন বলেই তা পরিত্যাজ্য নয, কেননা অন্য কোন পথই নেই আজ মানুষের সামনে। আজকের দিনের সত্যিকার বিপ্লবের উৎস এই প্রশ্নের মধ্যেই।

গ্রামবাসীদের প্রতি

(শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে কথিত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধুগণ, আমি এক বৎসর প্রবাসে পশ্চিম মহাদেশের নানা জায়গায় ঘুরে আবার আমার আপন দেশে ফিরে এসেছি। একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার—অনেকেই হয়তো তোমরা অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশ বিদেশ হতে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভিতর থেকে—এরকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করিনি। তারা সুখে নেই। সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র, নানারকম আযোজন উপকরণের সৃষ্টি হযেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তি তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, সুগভীর একটা দুঃখ তাদের সর্বত্র অধিকার করে রয়েছে।

আমার নিজের দেশের উপর কোনো অভিমান আছে বলে এ কথাটি বলছি মনে কোরো না। বস্তুত য়ুরোপের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। পশ্চিম মহাদেশে মানুষ যে সাধনা করছে সে সাধনার যে মূল্য তা আমি অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করি। স্বীকার না করাকে অপরাধ গণ্য করি। সে মানুষকে অনেক ঐশ্বর্য দিযেছে, ঐশ্বর্যের পন্থা দিয়েছে, বিস্তৃত করে দিয়েছে। সব হয়েছে। কিন্তু দুঃখ পাপে। কলি এমন কোন ছিদ্র দিযে প্রবেশ করে, তা প্রথমত চোখেই পড়ে না। ক্রমে ক্রমে তার ফল আমরা দেখতে পাই।

আমি সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁরা উদ্বিগ্ন হযে ভাবতে বসেছেন—এত বিদ্যা, এত জ্ঞান, এত শক্তি, এত সম্পদ, কিন্তু কেন সুখ নেই, শান্তি নেই! প্রতি মুহূর্তে সকলে

শঙ্কিত হয়ে আছে, কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। তাঁরা কী স্থির করলেন বলতে পারি না। এখনো বোধ হয় ভালো করে কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি, কিংবা তাঁদের মধ্যে নানান লোক আপন আপন স্বভাব অনুসারে নানারকম কল্পনা করছেন। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছি। আমি যেটা মনে করি সেটা সম্পূর্ণ সত্য কিনা জানি না, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, এর কারণটি কোথায় তা আমি অনুভব করতে পেরেছি ঠিক মত।

পশ্চিমদেশ, যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতি বিপুল প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন যন্ত্রের খোপে। ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ—হাজার হাজার বহু শত সহস্র। তারপর যান্ত্রিক সম্পদ প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা বড়ো বড়ো শহর তৈরী করেছে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার পরিধি অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক, লণ্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম উপগ্রামের প্রাণ শক্তি গ্রাস করে তবে একটা বিরাট দানবীর রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে—শহরে মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই—কলিকাতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানিনে।

মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে, সে তার সমাজধর্ম। সমাজের মধ্যে সে যথার্থ আপনার আশ্রয় পায় পরস্পরের যোগে। পরস্পর সাহায্য করে বলে মানুষ যে শক্তি পায় আমি তার কথা বলি না। মানুষের সম্বন্ধ যখন চারিদিকের প্রতিবেশীর মধ্যে, যখন আপন ঘরে এবং আপন ঘরের বাইরে ব্যাপ্ত হয়, তখন সে সম্বন্ধের বৃহত্ব মানুষকে আপনি আনন্দ দেয়। আমাদের গভীর পরিতৃপ্তি সেখানে, যেখানে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সম্বন্ধ নয়, সুযোগ সুবিধার সম্বন্ধ নয়, ব্যবসার সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সকল রকম স্বার্থের অতীত আত্মীয় সম্বন্ধ। সেখানে মানুষ আর সমস্ত থেকে বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু মানব-আত্মার তৃপ্তি তার প্রচুর পরিমাণে হয়।

বিদেশে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন—যাকে ওঁরা happi-

ness বলেন, আমরা বলি সুখ, এর আধার কোথায়। মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে এ কথাটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলার প্রয়োজন হয়েছে, কেননা, এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়ে যেখানে ব্যবসাঘটিত যোগ—সেখানে মানুষ এতো প্রচুর ফললাভ করে, বাইরের ফল—এতো তাতে মুনাফা হয়, এতো রকম সুযোগ সুবিধা মানুষ পায় যে মানুষের বলবার সাহস থাকে না, এটাই সভ্যতার চরমবিকাশ নয়। এত পায়! এত তার শক্তি! যন্ত্রখোপে যে শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তার দ্বারা এমনি করে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেছে, বিদেশের এতো লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেছে—তার এতো অহংকার। আর সেই সঙ্গে এমন অনেক সুযোগ সুবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্যযোগে উদ্‌ভূত হয়েছে। এগুলিকে চরম লাভ বলে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে ক'রে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েছে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস, সে হলো মানব সম্বন্ধ।

মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা সুখে দুঃখে আমার আপন, যাদের কাছে বসে আলাপ করলে খুশি হই, যাদের বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, যাদের আমার পিতৃস্থানীয় বলে জেনেছি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্র সন্তানের স্থানীয়। এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে।

এ কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশে অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রযোজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার

কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে'—এইভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয়, তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।

এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে! তাদের সুখ দুঃখের কি হিসেব আছে। প্রতিদিনের পাওনা গুনে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—মানবত্ব। দয়ামায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ কিছু থাকে না। কে দেখে তাদের ঘরে কি হযেছে না হয়েছে! একসময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিলো না তা নয়—প্রভু ছিল, দাস ছিল, পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল, ধনী ছিল, নির্ধন ছিল— কিন্তু সকলের সুখদুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজাপার্বণে আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রতিদিন তারা নানারকমে মিলিত হযেছে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও একপাশে বসে আনন্দের অংশ গ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জ্ঞানী-অজ্ঞানের মাঝখানে যে রাস্তা, যে সেতু, সেটা খোলা ছিল।

আমি পল্লীর কথা বলছি, কিন্তু মনে রেখো—পল্লীই তখন সব। শহর তখন নগণ্য বলতে চাই না; কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী, আপনার পল্লীকে, জন্মস্থানকে আপনার করে বাস করেছে। সমস্ত জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেছে। যা কিছু সম্পদ তারা পল্লীতে এনেছে। সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশালা বসেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, অতিথিশালা, যাত্রা, পূজা-অর্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলেছে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ গ্রামে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হতে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর সামাজিক মানুষের জন্যই তো সব।

ধর্মকর্ম সামাজিক মানুষেরই জন্য। লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়োবড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই ক'রে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়।

এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম; ভালো ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে; জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সুযোগ ঘটেছে। আমি তাকে অসম্মান করিনে। কিন্তু আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখ শান্তি থাকতে পারে না।

সমস্ত পশ্চিম-মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। তার গভীর শিকড় নেই। সকলে বলছে 'আমি ভোগ করব, আমি বড়ো হবো, আমার নাম হবে, আমার মুনাফা হবে।' যে তা করছে তার কত বড়ো সম্মান। তার ধর্ম-শক্তির পরিমাপ করতে গিয়ে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত শক্তির এই রকম উপাসনা এমনভাবে আমাদের দেশে দেখিনি। কিছু না, একটা লোক শুধু ঘুষি চালাতে পারে। সে ঘুষির বড়ো ওস্তাদ রাস্তা দিয়ে বেরোল, রাস্তায় ভিড় জমে গেল। খবর এল সিনেমার নটী লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে আসছে, গাড়ির ভিতর থেকে চকিতে তাকে দেখবে বলে জনতায় রাস্তা নিরেট হয়ে উঠলো। আমাদের দেশে মহদাশয় যাকে বলি তিনি এলে আমরা সকলে তাঁর চরণধূলো নেব। মহাত্মা গান্ধী যদি আসেন দেশশুদ্ধ লোক খেপে যাবে। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল, কিন্তু আছে হৃদয়, আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। আমি যতদূর জানি তিনি ঘুষি মারতে জানেন না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে তিনি বড়ো বলে স্বীকার করেছেন; আপনাকে তিনি স্বতন্ত্র করে রাখেননি; তিনি আমাদের সকলের, আমরা সকলে তাঁর, ব্যস, হয়ে গেল, এর চেয়ে বেশী আমরা কিছু বুঝিনে। তাঁর চেয়ে অনেক বিদ্বান, অনেক জ্ঞানী, অনেক ধনী আছে। কিন্তু আমাদের দেশ দেখবে

আত্মদানের ঐশ্বর্য। এ কি কম কথা! এর থেকে বুঝি, আমাদের দেশের লোক কী চায়। পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, আর কিছু নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ। কিন্তু দিনে দিনে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আমি গ্রামে অনেক দিন কাটিয়েছি, কোন রকম চাটুবাক্য বলতে চাই নে। গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ছলনা, বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি। শহরে কতকগুলি সুবিধা আছে, গ্রামে তা নেই ; গ্রামে যেটা আপন জিনিস ছিল তাও আজ সে হারিয়েছে।

মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি, গ্রামবাসী, তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজ বন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকুল্যের অপেক্ষা কোরোনা। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেছি, কেননা তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে। ভিত যতই যাচ্ছে ধ্বসে, উপরের তলায় ফাটল ধরছে—বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।

এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে, আমাদের সহযোগী হও, তাহলেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ সবল হয়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক। তোমাদের দৈন্য দুর্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। আর সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের শক্তি সম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তিসমবায়ের সাধনা।

তাঁর ঝাঁটা এসে পড়লো বলে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আসলকথা, পৃথিবীতে যে-সব শহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরী হয়ে উঠেছে। দিল্লী বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্য লক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস সরোবরের সৌন্দর্য-শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়; যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল, তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই বলেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।

আমি মনে করি, আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্যতার লৌহবন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলী পর্যন্ত, গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছিল আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মতো গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন করে ধরে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনও সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনত। একদিকে দেশের হৃদয়ের ধারা, আর একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিত বিচ্ছেদ এসে দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেইজন্যেই কলকাতা আধুনিক শহর হলেও কোকিল শিশুর মতো তার পালনকর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত করে অধিকার করেনি। কিন্তু তারপরে বাণিজ্য-সভ্যতা যতই প্রবল

হয়ে উঠতে লাগলো ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চলল। এখন কলকাতা বাংলাদেশকে আপনার চারিদিক থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে, দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলো।

এক সময়ে মানুষ বলেছিল—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্যে নয়, তাঁর সৌন্দর্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটেনি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতির, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারুকার্যের মনের মিল ছিল। এইজন্যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনার ঐশ্বর্যে বিচিত্র করে সুন্দর করে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তার পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে। যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন, তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টারের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টারে মানুষ সবদিক থেকে আপনাকে খর্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এই জন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানে গেছে, সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটি লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি হানাহানির আর অন্ত নেই। তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে লোকালয় পঙ্কিল হয়ে উঠলো। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্ন পরিবেশনের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হলো। যাই হোক, আমার বলিবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, প্রচ্ছন্ন করে।……

·সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে এই হংকং এর ঘাট পর্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে এসেছি। সে যে কী প্রকাণ্ড, এমন করে তাকে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবরজঙ ব্যাপার। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে—সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিলছে, তার ভোজন

উৎকট, তার শব্দ উৎকট, এও সেই রকম ; এই বাণিজ্য ব্যাধটাও হাঁস-ফাঁস করতে করতে এক এক পিণ্ড যা মুখে পুরছে, সে দেখে ভয় হয়। তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কী! লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবুচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চির প্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে, এবং লোহার শিরাউপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।

একে দেখে মনে হয় যে, এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানবজন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার ল্যাজের আয়তন দেখলেই শরীর আঁতকে ওঠে। তারপরে, সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখি হবে, এখনো তা স্পষ্ট হয়নি ; সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায়, তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ঙ্কর স্থুল ; তার থাবা যেখানে পড়ে, সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে ; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ ল্যাজটা যখন নড়তে থাকে, তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তারপরে, তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করার জন্য এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবল থাবা থাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু জগতের এই প্রথম যুদ্ধের দানবজন্তুগুলো টিকল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁস-ফাঁসটা যখন অত্যন্ত বেশী চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবল-মাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখিনে, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই, বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে একদিন তাকে হার মেনে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিনীপনা কখনই কদর্য অমিতাচারকে অধিকদিন সইতে পারে না ; তাঁর

ঝাঁটা এসে পড়ল বলে। বাণিজ্য দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ডভাবের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে। একদিন আসবে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্য থেকে আবিষ্কার করে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই সর্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিমর্ষতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে।

প্রাণী জগতে মানুষের যে যোগ্যতা সে তার দেহের প্রাচুর্য নিয়ে নয়। মানুষের চামড়া নরম, তার পায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয় শক্তিও পশুদের চেয়ে কম ছাড়া বেশী নয়। কিন্তু সে এমন একটি বল পেয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা স্থানের উপরে ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করছে। মানুষের মধ্যে দেহ পরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে; তার মানেই হচ্ছে, নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে; সে যত কম আঘাত দেয়, ততই সে জয়ী হয়। সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্য দানবকেও একদিন তার দানবলীলা সংবরণ করে মানব হতে হবে। আজ এই বাণিজ্যে মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয়তো একেবারেই নেই; সেইজন্যে পৃথিবীতে ও আপনার ভার বাড়িয়ে চলেছে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিততে চাচ্ছে। কিন্তু একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোট, তার কর্মপ্রণালী সহজ—মানুষের হৃদয়কে সৌন্দর্যবোধকে ধর্মবুদ্ধিকে সে মানে, সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্যভাবে লুব্ধ নয়, তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত করে বড় নয়, সে যে সকলের সঙ্গে সন্ধি ক'রে বড়। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সবচেয়ে কুশ্রী। আপন ভারের দ্বারা সে পৃথিবীকে ক্লান্ত করছে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে সে বধির করছে। আপন আবর্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করছে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করছে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং মানব হৃদয়ের বিরুদ্ধে—এই

যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করছেই, তার সন্দেহ নেই। মুনাফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী দ্যূত ক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এখেলা ভাঙতেই হবে। যে খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেছে, সে কখনোই চলবে না।...

যেদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড় দেখতে পাচ্ছি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগে কোনোদিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাইনি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোট করে দেখেছিল। ব্যবসায়কে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করেনি। দেবপূজা ক'রে, বিদ্যাদান ক'রে, আনন্দদান ক'রে যারা টাকা নিয়েছে, মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশী দুঃসাধ্য এবং টাকার আয়তন ও শক্তি এতই বেশী বড় হযে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে মানুষের প্রকৃতির বদল হয়ে আসছে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করছে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে, টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক সময়ে যে মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানতো, এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করছে। রাজ্যতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে ঘরে বাইরে সর্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বীভৎসতাকে দেখতে পাচ্ছি না, কেননা লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।......

কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে সেইখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লজ্জা মাত্র করে

না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁষে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দিল, কলের চিমনি-গুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগলো, তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপুজগতে কি কুশ্রীতাই সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করছে—এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে।

খোলা চোখে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাও

তখন আমার বয়স কম ছিলো, ফ্রিল্যান্স জার্নালিজম করতে যত্র-তত্র বনবাদাড়ে ঘুরি। সেই সময়ে আমার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একবার দেখা করার সুযোগ ঘটে। সময়টা হলো ভারত স্বাধীন হবার বছর খানেক আর আমার দেশ শ্রীলঙ্কা স্বাধীন হবার বছর দুয়েক আগে। গান্ধীজী আমার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে একটু নজর দিলেন, দেখলেন আমি খাঁটি য়োরোপীয় সাজপোষাকে গিয়েছি। মহাত্মা তাঁর দন্তহীন মুখের সেই দিব্য হাসি দিয়ে আমাকে সম্বর্ধনা করে বললেন "হুম্ আমাদের দক্ষিণ-প্রতিবেশী দেশের একজন স্মার্ট যুবক দেখছি, বোসো।" পাশের চৌকিটাতে হাত দিয়ে বসতে বললেন। অত্যন্ত ভয়-বিব্রতভাবে আমার পূর্ব-প্রস্তুত প্রশ্নটি তাঁকে করলাম। "গান্ধীজী, আপনার কার্যকলাপের ফলে আমাদের এশিয়ার সব দেশই শীঘ্র স্বাধীন হতে চলেছে। এইসব দেশ সম্বন্ধে আপনার কোন একটি সাধারণ বাণী যদি থাকে, তবে সেটা কী হতে পারে?" সহসা যেন তাঁর মুখখানা কোন এক দুঃখ বা দুশ্চিন্তায় একটু গাঢ় ও গম্ভীর হয়ে গেলো। দিল্লীর সেই শীতের দিনের উজ্জ্বল আলোয় তারে বাঁধা চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর ভাবনার গভীরতা আমার চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বললেন, "আকাঙ্ক্ষার বহরটা কমাও এবং যা প্রয়োজনীয় তাই দাও। আকাঙ্ক্ষার তাগিদই আমাদের দুর্বল (vulnerable) করে ফেলে। আমাদের আকাঙ্ক্ষার বহর দিয়ে নিজের দুর্বলতা বাড়ানো কেন?"

এই কথা কয়টি গান্ধীয়ান অর্থনীতির কেন্দ্রীয় থিসিসের অতি সংক্ষিপ্তসার। জ্ঞানাহরণ সম্পর্কে, রাজনীতি সম্পর্কে, সমাজব্যবস্থা

সম্পর্কে, প্রতিদিনকার জীবনের অন্তর্মুখী চেতনার সঞ্জীবন সম্পর্কে, এইটাই তাঁর মূল বক্তব্য।

চীনের সাফল্য

মহাত্মা মনে করতেন মানুষের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক জীবনের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখা ঠিক নয়; "আমি মনে করি না যে আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে। বরং জাগতিক ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ হতে হবে। অতএব আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ হওয়া চাই।"

আর এই কথোপকথনের তিরিশ বছর পরে যখন সমস্ত এশিয়ার দিকে তাকাই তখন আশ্চর্য হয়ে যাই যে একমাত্র চীন ছাড়া অন্য কোথাও এই আকাঙ্ক্ষার বহর কমানো অথচ জনসাধারণের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা নেই। এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির তুলনায় একমাত্র চীনেই কোনো অভাবী (needy) লোক নেই। সমস্ত পৃথিবীতে চীন নিজেকে একটি দরিদ্র বৃহৎ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে, জনসাধারণের দুর্ভেদ্য আত্মশক্তির ভিত্তিতে (peoples' invulnerability)। পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে ক্রমাগত অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেও আশি কোটি লোকের চীন বিরাট শক্তিধর হয়ে উঠেছে, যেখানে অন্যান্য দেশ জনসংখ্যায় কম হয়েও এবং অধিকতর প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হয়েও আকাঙ্ক্ষার চাপে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছে এবং দিন দিন তাদের প্রয়োজন মেটাবার অক্ষমতায় হতাশ হয়ে পড়ছে।

তৃতীয় বিশ্বের উভয় সঙ্কট

চীনের এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যারা এশিয়ার অন্যান্য দেশবাসী তারা নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সাফাইয়ের জন্যে নানা যুক্তিই দিয়ে থাকি—যেমন চীনাদের রাষ্ট্রনীতি, সেকুলার নিরীশ্বরবাদ, রাজনৈতিক একনায়কত্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমরা যত যুক্তি-জালই বিস্তার করি না কেন, এই প্রশ্নটা তৃতীয় জগতের সামনে থেকেই যাচ্ছে যে, কেন অর্থনৈতিক চাহিদার চাপে আমাদের

জনগণের দুর্বলতা দিন দিন বেড়েই চলেছে, কেন ক্রমশ একটা সহনীয় দারিদ্র্য থেকে অসহনীয় দুর্গতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছি।

এই দুর্বলতা ক্রমশ আমাদের রাজনৈতিক দুর্বলতার মধ্যেও অনুপ্রবেশ করছে। কৃষিপ্রধান দরিদ্র দেশগুলির নেতারা, বিশেষ করে যারা পশ্চিমী আদর্শে শিল্পপ্রধান দেশগঠনের পথ নিয়েছেন তাঁরা, এই দুর্বলতার নানা ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করতে গিয়ে ক্রমশ নিজেরাও দুর্বল হচ্ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা দমন করার চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের রাজনৈতিক কাঠামোটি মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে—যাদের লক্ষ্য হলো অধিক হতে অধিকতর সম্পদ সংগ্রহ করা এবং তাদের ক্রম-বর্ধমান চাহিদার বহর বাড়িয়ে চলা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এইভাবে নিজেদের আত্মপ্রতারিত করছেন যে, তাঁরা নিজেরা যত ধনী হচ্ছেন তাঁদের দেশও বোধ হয় তত ধনী হচ্ছে! এই জাতীয় যুক্তির অনুসরণে সামাজিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ও মুল্যবোধের ক্ষেত্রে অনুরূপ "বিপ্লব" তাঁরা করছেন এবং জনসাধারণের উপরে নানাধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ডিসিপ্লিন চাপাচ্ছেন। এবং প্রজ্ঞাই (wisdom) যেখানে সম্পদ সেখানে তা একমাত্র ধনীদেরই আছে! নিজেদের ক্ষমতাসীন রাখার জন্য জনসাধারণের মতামত নেওয়াটা ধীরে ধীরে একটা মামুলী প্রথায় দাঁড়াচ্ছে।

শাসকশ্রেণীর শাসন ক্ষমতার এই দুর্বলতাগুলিকে দূর করার তাগিদে এইসব দেশ দিনদিন বাইরের সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, আর এইসব বাইরের শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি শত শত বৎসরের একতরফা বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা থেকে যে কলাকৌশল অর্জন করেছে তার চক্রজালে পড়ে সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলির অবস্থা দিনদিন কাহিল হয়ে পড়ছে। আজকে সহসা এই আর্থিক সাহায্যের কেন্দ্রগুলি ওয়াশিংটন, বন এবং মস্কো থেকে সরে গিয়ে যদি আরব মুলুকের রিয়াদ, তেহরান ও কোয়েতে চলে যায় তাতেও এই ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার ধারা পাল্টায় না।

সমস্যা সমাধানের এই ধরণের উপর উপর চেষ্টাগুলি সাময়িক হতে বাধ্য কারণ এসব চেষ্টার মধ্যে নিজেদের ভিতরটাকে পালটানোর কোনো লক্ষণ নেই।

এই ডেভেলপমেণ্টের মূল সংকটটি হলো, দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য

দূর করার উত্তরটাকে কি বাইরে খুঁজতে হবে? অগ্রগামী দেশগুলি যাকে ভালো মনে করে সেটাকেই কি এসব দেশের ভালো বলে মেনে নিতে হবে অথবা নিজেদের দেশের ভিতরেই কি তার সমাধানের সূত্রটি বার করতে হবে (দরকার হলে ফেলে আসা ইতিহাসের দিকে তাকিয়েও)? উন্নয়নের মূল্যায়ন নির্দিষ্ট করার সময়ে কি আমরা এই ভুলটি করে বসবো যে বেশী করে পাওয়াই বড় হয়ে ওঠার সমার্থক (equate **having** more with **being** more)!

যথেষ্ট বনাম আরো

উপরিউক্ত সংকট যেমন সমাজের ক্ষেত্রে তেমনি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আজ মুখোমুখী উপস্থিত। বহিরঙ্গের পরিবর্তন ভিতরের পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। যদি এই দৃষ্টি দিয়ে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে চাই তবে আমাদের অর্থনীতির স্ট্রাটেজী ও রাজনীতির ধরন এমনভাবে নির্ধারিত করা দরকার যাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাওয়ার চেয়ে হওয়ার মূল্যটাই বাড়ে। এশিয়ার বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠস্বরটাই বোধ হয় শেষ, যাঁরা বলতে চেয়েছিলেন "আরো, আরো চাই" এর ক্রমবর্ধমান দাবির বিরুদ্ধে "ইহাই যথেষ্ট"কে যদি দাঁড় করানো না হয় তাহলে মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো সাম্য স্থাপন সম্ভব নয়। গান্ধীজী বলেছিলেন, "সভ্যতার সত্যিকার মাপকাঠি চাহিদার বহর দিয়ে হয় না বরং স্বেচ্ছাকৃতভাবে এই চাহিদাকে সংযত করার মধ্যেই তা রয়েছে, এরই মধ্যে সত্যিকার সুখ ও শান্তি পাওয়া সম্ভব এবং মানুষের সেবা করার ক্ষমতা এই পথেই বৃদ্ধি পেতে পারে।"

এই দৃষ্টিভঙ্গীকে যে আমরা হেলায় ফেলে দিয়েছি, পরিত্যাগ করেছি, তার দিকে আরেকবার ফিরে তাকানো দরকার। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আমাদের ক্রমবর্ধমান অমানুষিক দুর্গতি থেকে কোটি কোটি মানুষকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রীর কথাই কি আমরা শুনছি?

গত ১০ই জুন মস্কোর হল-অব-কলামস-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সম্বর্ধনার উত্তরে যে ভাষণ দেন, তা কোন ভারতীয় কাগজে প্রকাশ হয়নি। রেডিওতে প্রচারিত হয়েছিল। ঐ ভাষণের বিশেষ একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি এইজন্য যে তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব আমাদের দেশের নেতারা, মন্ত্রীরা, প্ল্যানিং-এর লোকেরা ও জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারেন। অন্যান্য কথার মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:

"সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নত ধরনের উদ্যম সম্বন্ধে লেনিনের একটি কথা আমার মনে পড়ে; 'আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যম ও কাঠামোকে যে-কোন উপায়েই হোক জীবন্ত করে তুলতে হলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন হল শেখা (learn), দ্বিতীয় প্রয়োজন হলো শেখা, তৃতীয় প্রয়োজন হলো শেখা এবং তারপর দেখতে হবে এই শেখাটা কতগুলি প্রাণহীন অথচ মুখরোচক বুলি হয়ে রইলো কিনা এবং শিক্ষাটা আমাদের বাস্তব জীবনের সংগে অংগীভূত হলো কিনা।' ভারতও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিখছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত আমরাও বিশ্ব-সভ্যতার প্রাঙ্গণে পরে উপস্থিত। শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের ভুলত্রুটিগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন, যাতে আমরা সে সব ভুলের পুনরাবৃত্তি না করি এবং সমৃদ্ধ সমাজের হতাশা এড়িয়ে যেতে পারি। গতির জন্যই গতি, গতানুগতিকতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়ার মোহ থেকে আমরা নিবৃত্ত থাকতে চাই।

"একদেশের পক্ষে অন্য দেশকে শোষণ করা যেমন একটি পাপ, তেমনি আপন দেশের যে সমস্ত সম্পদ ঘুরে ঘুরে সঞ্চিত হয় না (non-

renewable resources) তাও বেপরোয়াভাবে শোষণ করে নেওয়া বা উজাড় করে দেওয়া পাপ। কেমন করে মানুষ বেঁচে থাকবে যদি মানুষ বন সম্পদ, জলাশয় ও বন্যপ্রাণী ইত্যাদি সব কিছুকে ধ্বংস ও নষ্ট করে দেয়, আর লক্ষ লক্ষ বৎসরে মাটির নীচে যে সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল তা সব শেষ করে দেয়? সোভিয়েত রাশিয়া এক বিরাট দেশ যার প্রভূত ধাতুজ সম্পদ আছে, তা সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন।

"ভারতের জনসংখ্যা বিপুল, অথচ তুলনায় তার ভূ-এলাকা কম, তার উপরে রয়েছে যুগ যুগ সঞ্চিত দারিদ্র্যের বোঝা। সেইজন্যই আমাদেরকে একটা সরল জীবনমান বেছে নিতে হবে এবং অবস্থার চাপেও তা আমাদের বাধ্য করবে। অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই আমাদের এই সীমা মেনে নিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ভোগবিলাসের বস্তুবাহুল্য কেবল মূল্যবান সম্পদের অপচয়, পরিমণ্ডল বিষাক্তকরণ ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। একটা সন্তোষজনক পরিস্থিতি করতে হলে আমাদের পুরোনো দিনের অন্তর্দৃষ্টির সংগে নতুন নতুন প্রত্যয়গুলির একটা সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। পুরোনো দিনের অনেকগুলি মূল্যবোধ এখনও মূল্যবান, নতুন দিনের অনেক কিছুই কুৎসিত। আবার আমি লেনিনের কথাই স্মরণ করছিঃ যা কিছু সুন্দর তাকে রক্ষা করতে হবে, তা থেকেই নতুনের ক্ষেত্র বিস্তার করতে হবে। সুন্দরকে একমাত্র পুরোনো বলেই বর্জন করবো কেন, পুরোনো বলেই তাকে পরিত্যাগ করে নতুনের নেশায় মেতে যাবো কেন? নতুন বলেই কি সবকিছুকে পূজো করতে হবে?······

"আমাদের লক্ষ্য খুব পরিমিত কিন্তু এই পরিমিত জীবনমান সকলের জন্য প্রাপ্য করে তুলতেও এই বিপুল জনসাধারণের প্রয়োজনে বিশাল কর্ম-কাণ্ডের উদ্যম সৃষ্টি করতে হবে।"······

অত্যন্ত দুঃখের কথা প্রধানমন্ত্রীর এইসব মৌলিকনীতি বা পলিসিগত বক্তব্য এদেশেই আলোচিত হয় না। এই বক্তব্য কি কেবল মস্কোর জন্য, আমাদের জন্য নয়? দু হাজার সালে আমাদের জনসংখ্যা একশ কোটির উপরে উঠে আসবেই। আমাদের যেসব সম্পদ একবার ফুরিয়ে

গেলে আর ফিরে আসবে না যেমন কয়লা, তেল, বিভিন্ন ধাতু ইত্যাদি, তা সত্যিই কত আছে এবং কতদিন চলতে পারে, কোন ধরনের পরিমিত জীবনমানের জন্য, এসব কি ভাববার সময় আসেনি? আজকের খিদে মেটাবার জন্য, ভবিষ্যতের সব সম্পদ আমরা উজাড় করে দিয়ে যেতে পারি কি? তাছাড়া জল, বিশুদ্ধ বায়ু, বনসম্পদ এসব ঘুরে ঘুরে পেলেও, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন আছে। যে পরিমিত ভোগ্যমানের কথা প্রধানমন্ত্রী মস্কোতে বলেছেন, সেই কথাই কি তাঁর মন্ত্রীরাও সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন? বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের তাগিদে দেশের যাবতীয় মৌলিক ধাতুজ সম্পদ ও জৈব জ্বালানি বিদেশে চালান করে দেবার সময় প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্য ঠিক ঠিক রক্ষা করে চলা হচ্ছে তো? 'একসপোর্ট অর পেরিস' এই শ্লোগান আজ বেপরোয়াভাবে উঠছে কেন? যে সব সম্পদ প্রকৃতি থেকে আমরা ঘুরে ফিরে পাই, যেমন ফল, ফসল, মাছ, ডিম, মাংস ইত্যাদি না হয় নিজেরা এখন না খেয়ে অপরিহার্য বৈদেশিক মুদ্রার জন্য কতকটা চালানই দিলাম কিন্তু ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে কয়লা ভর্তি জাহাজ সমুদ্রপথে নতুন নতুন ভারতীয় বন্দর থেকে যাত্রা সুরু করলেই, তা এমন সুসংবাদ বলে নাচানাচি হয় কেন? বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের কিছু সংগ্রহ করতেই হবে, কেননা নাফথা, পেট্রোল ইত্যাদির জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা চাই। কিন্তু নন-রিনিউয়েবল সম্পদ উজাড় করে দিয়ে যে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করবো যদি তা দিয়ে তিন কোটি ডলারের এক একটি জাম্বোজেট বিমান কিনি, সেটা কি তার সদ্ব্যবহার হলো? না এর মধ্যে পরিমিত জীবনমান, সরল সহজ জীবনমানের লক্ষ্য প্রকাশ পায়?

এই সরল সহজ পরিমিত জীবনমানের প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, শিক্ষক, অধ্যাপক, সম্পাদক, লেখক মেনে নিতে প্রস্তুত কিনা দেখতে হবে। আবালবৃদ্ধবনিতা বা জনসাধারণের সামনে কোন্ ধরনের সভ্যতার মডেল আমরা উপস্থিত করেছি? একথা মনে রাখা দরকার, একমাত্র উচ্চ মধ্যবিত্তরাই আজ উচ্চমান ভোগসর্বস্ব জীবনের দাবিদার নয়, এই ঘোড়দৌড়ে সর্বশ্রেণীর লোকেরাই যোগ দিতে পাগল। এই উন্মাদ দৌড় দেশকে রক্ষা করবে কি? প্রধানমন্ত্রীর

নির্দেশেই শাসক শ্রেণীর লোকেরাই কি শুনতে প্রস্তুত? সর্বজনস্বীকৃত এই সরলজীবন দর্শনের প্রস্তুতি করছেন কোন রাজনৈতিক দল?

প্রধানমন্ত্রী ঐ সম্বর্ধনা সভায় বলেছেন যে খুব সীমিত বা পরিমিত বা মডেস্ট জীবনমান যাকে মোটা ভাত মোটা কাপড়-এর মান বলা চলে, সকলের জন্য তা বাস্তবে কায়েম করতে হলে আমাদের মত বিরাট দারিদ্র্যজনবহুল দেশে যে ধরনের প্রয়াস করতে হবে তা হতে হবে বিপুল বা বিশাল। সেই বিরাট প্রচেষ্টার প্রধান ও অফুরন্ত ভাণ্ডার হলো আমাদের বিপুল জনবল। প্রকৃতি থেকে ঘুরে ঘুরে যে সব শক্তি ও সম্পদ পাওয়া যায় তার উপরেই এই বিরাট জনবল ও পশুবলকে লাগাতে হবে। মূলধনও লাগবে, কিন্তু মুলধন যাতে ভোগবিলাসের পিছনেই না লাগে, উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগে, এবং সেইসব উৎপাদনের পিছনেই লাগে যারদ্বারা সর্বসাধারণের মোটামুটি জীবনমানের প্রয়োজনটা মিটতে পারে, মুলধনের ব্যবহার সম্বন্ধে তেমনি হুঁশিয়ার হতে হবে। আর লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে যেসব মৌলিক সম্পদ বা রিসোর্স আর ফিরে আসবে না, তার ব্যবহার যতটা কম করে পারা যায়। সূর্যরশ্মি, সমুদ্রের জোয়ারভাঁটা, জলপ্রপাত, নদী, বৃষ্টি, বৃক্ষ ও বনানি এসব চিরন্তন সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উপরেই নির্ভরশীল হতে হবে। কিন্তু এসব কিছুই সম্ভব হবে না, যদি না আজ যাঁরা সমাজপতি হয়ে বসেছেন, শিক্ষাদীক্ষায় ও নিত্যনতুন হালচালে ও ফ্যাসনে দেশের লোককে পাগল করে তুলছেন তাঁদের যদি সংযত করা না হয়।

পদ্ধতির আগে লক্ষ্যটা ঠিক করা দরকার

গত ১৬ই জুলাই, ১৯৮০, যুগান্তর পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধের ('দারিদ্র দূর করার প্রযুক্তি') প্রতি হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। দারিদ্র দূর করার হাতিয়ার হিসেবে এপ্রোপ্রিয়েট টেকনলজি বা আমাদের দেশে প্রযোজ্য উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে একটি বক্তব্য ক্রমশঃই জোরদার হয়ে উঠছে। কিন্তু এজাতীয় যুক্তি সম্বন্ধে কতগুলি প্রচলিত ভুল ধারণাও ঢুকে যেতে পারে। মনে হতে পারে যে আমাদের দারিদ্র দূর করার জন্য যে সব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তদনুযায়ী যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে বোধ হয় এই এপ্রোপ্রিয়েট টেকনলজি ছিল না। যারা রক্ষণশীল চিন্তাধারায় ডুবে থাকেন, তারা হয়তো ধরে নেবেন যে আমাদের দেশে ভারীশিল্প জাতীয় ষ্টীল-মিল, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত ভারি ভারি যন্ত্রপাতি লাগে, রাসায়নিক সার প্রস্তুত করার জন্য যে সমস্ত বিরাট বিরাট কলকারখানা দরকার হয়, এগুলির উপর জোর দিতে গিয়েই বুঝি বা আমাদের উন্নয়নের কার্যসূচীতে এমন ধরণের বিকৃতি হয়েছে, যার জন্য এইসব ভারীশিল্প বা যন্ত্রশিল্পই যেন দায়ী। আমরা যদি গ্রাম্য কুটিরশিল্প, ছোট ছোট শিল্পের উন্নতি ও চাষবাসের উন্নতি নিয়ে থাকতাম, তাহলে বুঝি আমাদের দারিদ্রের এত বড় বিস্তার ঘটত না।

কিন্তু এপ্রোপ্রিয়েট টেকনলজি কথাটার এরকম সরল অর্থ ধরলে খুবই ভুল করা হবে। সামান্য চাষবাসের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বেড়েছে, অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ১৯৯০ সালে আরও দ্বিগুণ হবে, অন্ততঃ তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মোটামুটি মোটা ভাত কাপড়

দিয়েও যদি এই জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে আমাদের দেশে যে প্রচলিত টেকনলজি আছে তাতে তো কুলোবেই না, এবং এপ্রোপ্রিয়েট-টেকনলজি বলতে যে ধরণের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, তার এপ্রো-প্রিয়েটনেস্ সম্পর্কেও একটু হুঁসিয়ার হওয়া কর্তব্য। মাথাপিছু একটি লোকের জন্য যত খাদ্য ও বস্ত্রের দরকার হয়, তারজন্য যতটা জমি লাগে, এটা ধরেই যদি আমরা হিসেবটা সুরু করি, তাহলেও দেখা যাবে, অখণ্ড ভারতবর্ষে যেখানে ৩০ কোটি লোক ছিল, আজ খণ্ডিত ভারতবর্ষে সেখানে ৬০ কোটি লোক রয়েছে। তখন বুঝতে হবে, মাথা-পিছু জমির পরিমাণ খুবই কমে গেছে; হয়তো অর্ধেকেরও কম হযে গেছে; এক-তৃতীয়াংশ হয়েছে। অতএব অখণ্ড ভারতবর্ষের ৩০ কোটি লোকের মোটা ভাত-কাপড় যোগাড় করতে যে টেকনলজি সমর্থ ছিল না, (কেন না সেদিনও দেশে বেশ দারিদ্র ছিল; ইংরেজ আসার আগেও দেশে দারিদ্র ছিল) সেখানে দ্বিগুণ এই দরিদ্র লোকেদের এই খণ্ডিত ভারতবর্ষে, সেই পুরোনো টেকনলজি দিয়ে কি করে খাওয়ানো পরানো যাবে? ফলে দেখা যাচ্ছে, একই জমি থেকে দু'তিনটি করে ফসল তুলতে হবে, এবং প্রতি ফসলের উৎপাদন দু'তিন গুণ বাড়াতে হবে। কেবল খাদ্যের জন্যই নয়, পশু খাদ্যের জন্য ও তেলের জন্য, পাটের জন্য, রেশমের জন্যও জমি রাখতে হবে এবং তারও উৎপাদিকা শক্তিকে কয়েকগুণ বাড়াতে হবে। এর চাপটা যে কত বড়, সেটা, আজকে গ্রামে যে এক চিলতে জমিও শ্মশানের জন্যও পড়ে নেই, এর থেকেই বোঝা যায়। কাজেই এপ্রোপ্রিয়েট টেকনলজি বলতে আমরা মান্ধাতা আমলের টেকনলজি বলব না বা পুরানো টেকনলজির কিঞ্চিৎ হেরফেরও বলবো না। এইযে সামান্য কাজটা অর্থাৎ একই জমি থেকে তিনটে করে ফসল তোলা এবং প্রতি ফসলের উৎপাদন অন্ততঃ দ্বিগুণ করে তোলা এবং ফসল যাতে রোগপোকা, খরা-প্লাবন ইত্যাদিতে নষ্ট হয়ে না যায়, তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার কাজটা করতে গেলে, প্রচুর যন্ত্রপাতি ও শক্তির প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এরজন্য বিদ্যুৎ লাগবে, পাম্প লাগবে, পাইপ লাগবে, রাসায়নিক সার লাগবে, কীটনাশক ঔষধ লাগবে এবং এগুলি সব করতে গেলে ষ্টীল-মিল লাগবে, ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প লাগবে, বিদ্যুৎ

লাগবে, রাসায়নিক শিল্পের বিরাট বিস্তার করতে হবে। এটা মানতেই হবে।

তবে ভুলটা হল কোথায়? এসবই তো করা হয়েছিল, ভারী শিল্প হচ্ছিল, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সারের কলকারখানা ইত্যাদি সবই হচ্ছিল। অর্থাৎ দেশে যন্ত্রযুগ সুরু হয়েছিল। ভুলটি হয়েছিল এখানে এই, যে বিরাট বিপুল জনসাধারণের মোটা ভাত কাপড় তৈরীর জন্য ওইসব ভারী যন্ত্রশিল্প এবং যন্ত্রায়ণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নি, মূলধনের বিনিয়োগও সেদিকে করা হয় নি; করা হয়েছিল মুষ্টিমেয় লোকের উন্নতির মান বাড়িয়ে তোলার জন্য। যদিও উদ্দেশ্য হয়তো তা ছিল না। এ সমস্ত উন্নতি উদ্যোগ পরিকল্পনার ফলে উপরতলার শতকরা দশটি লোকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই একটার পর একটা কলকারখানা বসেছে। দেশের শতকরা ৮০টি লোকের যা প্রয়োজন, তা মেটাবার জন্য নয়। কিন্তু এই ধরণের প্রগতি আপন স্ববিরোধিতায় আপনিই আটকে যায়। এই শতকরা ৮০টি লোকের ক্রয়ক্ষমতা যদি না বাড়ে, তাদের দারিদ্র যদি বাড়তেই থাকে, তবে একথা অনস্বীকার্য যে শিল্পায়ণের ফলশ্রুতি একটা সীমিতবাজারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সেই উপরতলার শতকরা দশটি লোকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই দেশের যাবতীয় শিল্পকাণ্ডটিকে আবদ্ধ রাখতে হয়। এর ফলে শিল্পও আর এগোতে পারে নি, শিল্প দিন দিন রুগ্ন হয়ে যায় ভারীশিল্প-জাত দ্রব্য দেশে বিক্রী হয় না বলে, সস্তা দরে অথবা ঘাটতি দিয়েও বিদেশে চালান দিতে হয়, বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি মিটাতে। তার মানে, শিল্পের জন্যই শিল্প হয় না। শিল্পকে এই বিরাট কৃষিপ্রধান দরিদ্র দেশের দারিদ্র দূর করার জন্য একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে যদি ব্যবহার করতে পারি তবে শিল্পেরও এমন সংকট থাকে না। এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও বেকার সমস্যা এমন প্রচণ্ডভাবে গ্রামে গ্রামে থাকত না ও গ্রামের বেকারেরা সহরে এসে ভীড় করতো না। কাজেই 'এপ্রোপ্রিয়েট' কথাটির মৌলিক তাৎপর্য, কৌশলগত নয়, লক্ষ্যগত। এটা কৌশলের প্রশ্ন নয়, এটা আদর্শের প্রশ্ন; সভ্যতার মডেলের প্রশ্ন।

কুটির শিল্পের কথাই যদি আমরা ধরি বা ছোট ছোট শিল্পের কথাই যদি ধরি, সেখানেই বা কি দেখি? যে-সমস্ত কুটির শিল্প বা ছোট শিল্প আজও ধুঁকে ধুঁকে কোনমতে বেঁচে আছে, সেখানকার মজুরদের বা স্বনির্ভর ছোট ছোট মালিকদের—শনি নেই, রবি নেই, কোন ছুটি নেই, কোন ওয়ার্কিং আওয়ার্স নেই, কাঁচামাল নেই, পুজি নেই, বাজার নেই, দারিদ্রের মধ্যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যেভাবে জীবন-যাপন করছে তা কি আমরা জিইয়ে রাখতে চাই? এটাকে কী আমরা কোন উন্নতির ব্যবস্থাপনা বলে মনে করব?

যদি তাদের দ্রব্যের চাহিদার দিকে তাকাই, তবে দেখি এই ছোট ছোট কুটির শিল্প বা হস্তশিল্পের মালও বিক্রী হয় না। দেশে যে ধরণের চাহিদার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সৃষ্টি হযেছে তাতে তাঁতীর বউও তাঁতের শাড়ী পরতে রাজী নয়, মুচির ছেলেও মুচির তৈরী স্যাণ্ডেল পরতে প্রস্তুত নয়, চাষীর ছেলেও আর হাল-লাঙ্গল নিয়ে জলে-কাদায় নামতে প্রস্তুত নয়। শাঁখারীর শাখা কেউ পরতে রাজী নয, কাঁসারীর বাসনপত্রও বাজারে বিক্রী হয় না। দেশী খুরে দাড়ি কামানো হয় না, বিলিতী মডেলের ব্লেড ছাড়া দাড়ি কামানো সম্ভব হয় না। কাজেকাজেই এপ্রোপ্রিযেট টেকনলজি কথাটা একটু ভাল করে বুঝে গ্রহণ করা উচিত।

কাজেই প্রশ্নটা এপ্রোপ্রিয়েট টেকনলজি দিয়ে সুরু করা ঠিক নয়। এপ্রোপ্রিয়েট টেকনলজি তো হতেই হবে। আমাদের যা সম্ভব, আমাদের দেশের যা সম্পদ, আমাদের দেশের যা শ্রমশক্তি ও শ্রম-নৈপুণ্য তার উপর স্বনির্ভর হয়ে যে ধরণের টেকনলজি দরকার, সেটাতো করতেই হবে। কিন্তু সেসব কখনোই হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এপ্রোপ্রিয়েট আইডিওলজি না মানা হয়। সভ্যতার মডেল বা এপ্রোপ্রিযেট সোসাইটিটা কী হবে সেটা আগে ঠিক করা দরকার। যে কথা উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে শেষ প্যারাতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কথা উল্লেখ করে, সেটা দিয়ে সুরু করতে হবে, সেটা দিয়ে শেষ করলে হবে না। অর্থাৎ একদা গান্ধীজী যা বলেছিলেন, 'প্রয়োজনটা মেটাও, কিন্তু অভাব বোধটা বাড়িও না।' এই প্রয়োজনটা মানে, আমাদের উচ্চবিত্তদের প্রয়োজনের কথা তিনি বলেন নি। কারণ উচ্চমধ্যবিত্তের প্রয়োজন ও

অভাববোধের মধ্যে কোন সীমা নেই। তাদের চক্ষে, ইউরোপ আমেরিকার মডেলটা সর্বদা জাগরূক আছে। গান্ধীজী যে প্রয়োজনের কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে জনসাধারণের প্রয়োজন অর্থাৎ সকলের জন্য মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের প্রয়োজন। সকলের জন্য কাজের প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজনটা যদি সর্বসাধারণের কাছে স্বীকৃত না করানো যায়, অর্থাৎ উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরাও যদি সাধারণ মোটা ভাতকাপড়ের ভোগ্যমান স্বীকার করে না নেয়, তবে "ছোটলোকের" জন্য একরকমের ভোগ্যমান আর "বড়লোকের" জন্য আরেকরকমের ভোগ্যমান এই দুই জাতীয় ভোগ্যমান দিয়ে কোন একটি বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা। এই মৌলিক প্রস্তাবটির সম্যক সিদ্ধান্ত হলেই ভারীশিল্প, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে একটা সুপরিকল্পিত যথাযথ বা এপ্রোপ্রিয়েট কর্মপন্থা গ্রহণ করা চলে এবং তা কার্যকর হতে পারে।

মধ্যবিত্তের দুঃস্বপ্ন

শরৎকাল উপস্থিত। শারদীয়া উৎসব আসলে পাকা ধানের ফসল তোলার উৎসব। কিন্তু ইতিমধ্যেই চারিদিক থেকে হাহাকার উঠেছে। মাঠময় ধান—সোনালি ধান। ১৩৮ লক্ষ একর ধান চাষের জমির মধ্যে ৩।৪ লক্ষ একরের ধান নাকি প্লাবনে ভেসে বা ডুবে গেছে। বাংলায় বর্ষায় প্লাবন হবে না কোথাও—এমন ধরণের আহাম্মুকি হিসাব কোন রাষ্ট্রকর্তাদেরই করা উচিত নয়। কোথাও কোথাও বন্যা হবেই, কোন কোন ক্ষেত্রে অনাবৃষ্টিও হবে—এটা ধরেই নিতে হবে। সেচ ও বন্যা-নিরোধ ব্যবস্থা এরই জন্য। বর্ষার জলের উপরেই এখন আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নই। মাটির নীচের জল, নদীর জল, দূর দূরান্তের বৃষ্টির জলের ক্যাচমেন্ট এলাকা থেকে টেনে আনা বাঁধে বাঁধে বেঁধে রাখা জল, এসব ব্যবস্থা আয়ত্তাধীন, প্রযুক্তি বিদ্যার অধীন। ফলে এখন আমাদের অনেক মাঠেই বারোমাস ফসল ফলতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছেও। মাঠ কখনও বিশ্রাম পায় না, এমন এমন বিস্তৃত এলাকাও আমাদের আছে। আউশ, আমন, পাট, গম, আলু, সব্জি, তরিতরকারি, পশু খাদ্য ইত্যাদি এখন সারাবছরের কর্মকাণ্ডে পরিণত হতে পারে—প্রায় সর্বত্র। হচ্ছেও নাকি। অনেক টিউবওয়েল, পাম্পসেট, লিফ্‌ট্‌পাম্প, নদী প্রকল্প করা হয়েছে, ফসল বেড়েছে, অথচ অভাব দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। শারদীয়া উৎসবে কলকাতা মহানগরীতে যখন ছেলে-ছোকরারা—মাপ করবেন—যুবক যুবতী, তরুণ তরুণী—এককথায় 'যুব-শক্তি' উন্মত্ত উৎসবে মাতোয়ারা থাকবে, তখন গ্রামদেশে হয়তো লঙ্গর-খানা খোলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না। এই বিচিত্র পরিস্থিতির বিকট প্রকাশ, একই সঙ্গে সম্ভোগের সমারোহ ও দুর্ভিক্ষের ক্রমবর্ধমান কালো ছায়ার বিস্তার, বর্তমান সভ্যতার একটা অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ।

মহানগরীর জন্য

মহানগরীর জন্য যে রেশন ব্যবস্থা চালু আছে তার জন্য তণ্ডুল নেই, দিল্লীর দরবারে ট্রাঙ্ককল, এস-ও-এস, এম-পিদের ধর্না, মন্ত্রীদের দুবেলা ছুটোছুটি, এসব তো লেগেই আছে। স্টাটুটারী রেশনিং ব্যবস্থা যায় যায়। এম-আর ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে হাহাকার। যারা ধান গম আলু পাট ইত্যাদি ফলায়, তারা একবেলাও খেতে পাচ্ছে না। তবে এত যে ফসল হলো বা ফসল বৃদ্ধি হলো, তা গেলো কোথায়? পাঁচ লক্ষ টন লেভী ধার্যের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ ষাট হাজার টন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এটা একটা ঠাট্টার মত শোনায়। অর্থাৎ গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে মাত্র চার টন চাল সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন! এদিকে গ্রামের শতকরা ৭০/৮০টি লোক খেতে পাচ্ছে না, বিনামূল্যে লঙ্গরখানা খোলার দাবী নিয়ে এম-এল-এরা, রাজনৈতিক দলের নেতারা ক্রমবর্ধমান দাবিদাওয়ার বহর তুলছেন।

ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়

সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্ব খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখা যায়! অহোরাত্র গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কংগ্রেস, নব কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস—অর্থাৎ "যুবশক্তিকে" ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, মজুত উদ্ধারের জন্য। এজন্য অন্যান্য দলের যুবশক্তিকেও আহ্বান করা হয়েছে। সি-পি-আই পূর্ব থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। অন্যান্য দলগুলিও মজুতদার জোতদারদের উপর কেন খড়গহস্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হচ্ছে না বলে প্রচুর গলাবাজি করে থাকেন।

মজুতটা কোথায়?

কিন্তু মজুতটা আছে কোথায়, কাদের কাছে? সরকার গ্রামবাসী দরিদ্রদের কাছে একটা টোপ ফেলেছিলেন, "গ্রামের উদ্বৃত্ত ধান চাল সংগ্রহে তোমরা সাহায্য করো, জোতদার মজুতদারদের কাছ থেকে উদ্ধার

করা ধানচাল গ্রামেই রাখা হবে, এম আর সপের মারফৎ নির্দিষ্ট দরে তোমাদেরকেই তা দুর্দিনে দেওয়া হবে—তোমরা সস্তায় খাবার কিনে খেতে পারবে।" গ্রাম্য ধনী বা মজুতদার জোতদারেরা পাল্টা যুক্তি কানে কানে ফুস ফুস করে গ্রাম্য দরিদ্রদের বুঝিয়ে দিলো, "ধান তো না হয় গ্রামের এম আর সপে মজুত থাকলো, কিন্তু তোমরা কিনবে কি দিয়ে, বছরে তিন মাসের বেশীতো তোমাদের কোন কাজ নেই—রোজগারও নেই। বাকী ৮/৯ মাস তো তোমাদের কোন রুজি রোজগারের রাস্তাই নেই—যত সস্তাতেই সরকার তোমাদের চাল দিতে চান, তা তোমাদের কিনবার ক্ষমতার বাইরে থাকবেই। তার চেয়ে বরং আমাদের (জোতদার, মজুতদার, মহাজনদের) সঙ্গে সহযোগিতা করো, তোমাদের ঘরে ঘরেই ধান মজুত করে রাখি, তোমরা তা ঢেঁকি দিয়ে ভেনে হোক, আর হাস্কিং মেশিনেই হোক, চাল করে নিয়ে কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি প্রভৃতি উচ্চ ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন সহর বন্দরে চোরাচালানের বাহন হিসাবে লেগে যাও। তাতে তোমাদের সারাবছরের অনেকটা সময়ের জন্য একটা রুজি রোজগারের ব্যবস্থা থাকবে। শোনোনি কলকাতায় বাবুরা তিরিশ টাকা দরে ইলিসের ডিমের কেজি কিনে খায়? বিশটাকা দরে চিংড়ি মাছ খায়! একশ দেড়শো টাকা দরের শাড়ী আছে এমন ভদ্রমহিলার ওখানে অভাব নেই! ওরা দরকার হলে দশটাকা কেজী দরে চাল কিনেও খেতে পারবে। ওদের পয়সা অঢেল, হিসেব নেই। প্রতিবছর কলকাতায় শতাধিক কোটি টাকা ঢালা হয়, দিল্লীতে সহস্রাধিক কোটি—ঐ টাকাগুলি মহানগরীর লোকেদের মধ্যে চলাফেরা করে। কলকাতাকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখবে, ছাত্র ও যুবশক্তিরা পাহারা দিয়ে বেড়াবে? ছ্যাঃ ছ্যাঃ, দু-চার আনা ওদের দিযেও তোমাদের চার পাঁচ টাকা কেজিতে চাল বিক্রি করা কঠিন হবে না। আমাদের ২/২·৫০/৩ টাকা দিও, বাকীটা তোমরা নিও। তোমাদের একটা ক্রয়-ক্ষমতা আমরা (জোতদারেরাই) করে দিচ্ছি। সরকার দিচ্ছে হয়তো কখনো কখনো জি-আর, টি-আর, তাতে কি খিদে মিটে? শুধু শুধু হাড় ভাঙ্গা খাটুনি, রদ্দুরে পুড়ে খাটতে যাবে কেন?"

সব নীতিই ব্যর্থ

ব্যস, গ্রামের দরিদ্ররা এখন থেকে তাই গ্রাম্য জোতদারদেরই সমাজতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে বেশী নির্ভরশীল মনে করতে সুরু করেছে। সরকারের অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জোতদার মহাজনদের হাতে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ। গ্রাম্য দরিদ্রদের কে হাত করতে পারবে, সহরের শ্রমজীবী বা প্রোলেতারিয়েতেরা, না গ্রাম্য কুলাকেরা—রুষ বিপ্লবকালে লেনিনদের ছিল এটাই একমাত্র বিচার্য বিষয়। যদি প্রোলেতারিয়েত না পারে, আর গ্রাম্য ধনীরাই পারে, তবে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হবে, ধনতন্ত্রই কায়েম হবে। লেনিনদের কাছে এটাই ছিল সেদিন জীবন-মরণ সমস্যা। কিন্তু ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদের (সরকারী সমাজতন্ত্রী, বেসরকারী সমাজতন্ত্রী, বা সাম্যবাদী, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী সহ সকলের) বাহন তো প্রোলেতারিয়েত নয়, এদের বাহন হলো মধ্যবিত্ত সমাজ ও তার যুবশক্তি বা ইয়ুথ-পাওয়ার। এই যুবশক্তিরাই বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, সুবিধার অন্বেষণে এরা কখনো বাম, অতিবাম, মধ্য, দক্ষিণ সকল দলে এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছেন। এদের চেহারা, চরিত্র, ধর্ম, একই। চোঙ্গা প্যাণ্ট, লম্বাচুল, জুলফিকার আলীর দল এরা। চেহারা চরিত্র এক, একটু ইতর বিশেষ থাকলেও। কেন এমন অভিযোগ করছি ? এই ছেলেদের সামনে আমরা কোন্ ধরণের সোনালী স্বপ্ন উপস্থিত করেছি—আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের দার্শনিক ও নান্দনিকেরা ?

একটাই সভ্যতা

সভ্যতা বলতে আমরা একটাই সভ্যতা বুঝি—অর্থাৎ ভোগসর্বস্ব, ষড়রিপুবর্ধক, ঐশ্বর্যমণ্ডিত আধুনিক সভ্যতা—যার বাস্তবরূপ হলো ইউরোপ—বিশেষ করে আমেরিকা। আমেরিকাতেও দরিদ্র আছে, বেকার আছে—কেননা আমেরিকা ধনতান্ত্রিক। কিন্তু আমরা যে সমাজতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্র আরও বেশী ভোগ্যবস্তু ও ভোগসম্পদ সৃষ্টি করতে পারবে—সকলের জন্য। রাশিয়াতে এমন ব্যবস্থাপনা হতে চলেছে যে অদূর ভবিষ্যতে ভোগের ব্যাপারে আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ এই

ভোগবাদ, অবাধ ষড়রিপুবর্ধক Sensate civilization-ই হলো, আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির লক্ষ্য। এসব স্বপ্নদিয়েই আমাদের গণতান্ত্রিক, একতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী ইডিওলজি গড়া। রাশিয়াতেও নাকি নবযুবক-যুবতীরাও ভোগবাদী আমেরিকার ভক্ত হতে চলেছে। চীনারা অবশ্য আলাদা। তারা ভোগবাদকে সাম্যবাদের সঙ্গে এক করে ফেলেনি। ফলে চীনারা নাকি আর সাম্যবাদী নয়! আমাদের সমাজতন্ত্রে বা সাম্যবাদে আমরা মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম, মুনিষ মাহিন্দার সবাইকে বিড়লা বানিয়ে দেব—অর্থাৎ বিড়লারা যা যা ভোগ করতে পারেন, তা সবার জন্য প্রাপ্য করে দেব; বিড়লাদের নাবিয়ে আনা নয়, সবাইকে বিড়লাবাহাদুর করে দেওয়া হবে। এবং তা নাকি করা যায়। বিজ্ঞানের বাহাদুরীটা দেখেছো? পারমাণবিক শক্তি শান্তিমুলক ও গঠনমুলক কাজে লাগাতে যাচ্ছি, সূর্যকিরণ থেকে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা থেকে, মাটির তলে অফুরন্ত উত্তাপের উৎস থেকে—শক্তিতে শক্তিতে দেশটাকে প্রায় তেজস্ক্রিয় করে ফেলবো। সোনার স্বপ্ন কে কত বেশী করে দেখাতে পারে সেই পক্ষের তত জয়, "যুগ যুগ জীও"—র অধিকারী তারাই। ফলে স্কুল-কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-ছোকরারা মাথা গরম করে ফেলেছে। দল বেঁধে এদল ওদলে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে, দলপতিদের অশ্রাব্য গলাবাজী দিনকে দিন অসহ্য হয়ে উঠছে, ছেলেদের ধৈর্য থাকছে না, তারা খণ্ড খণ্ড হয়ে নানা দলে ঢুকে পড়ে, পরস্পরের সঙ্গে মারামারি গুণ্ডাবাজী, বোমাবাজী করে বেডাচ্ছে। নেতারা চাকুরি দেবেন, দিচ্ছেন বলে কিছু কিছু আহাম্মক ছেলেদের পিছে পিছে ঘুরিয়ে মারছেন, অসংখ্য চামচের সৃষ্টি হচ্ছে। বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে অবাধ সাইকোফেন্সী। দেশে কাজ যত কমছে, উৎপাদন যত কমছে, শিল্প-বাণিজ্য যত রুগ্ন হচ্ছে, ছাঁটাই, লে অফ যত বাড়ছে, মন্ত্রীদের পক্ষে ছেলে-মেয়েদের চাকুরি দেবার ক্ষেত্র নাকি তত বাড়ছে। স্বনিযুক্তির ক্ষেত্র বাড়ছে নাকি, অর্থাৎ কারো ভাত মেরে, অপর কাউকে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। শিক্ষিত যুবকেরা বেবী ট্যাক্সি পাচ্ছেন, অটো রিক্সা, পাওয়ার টিলার—উদ্দেশ্য এরা কেরাণীগিরি না করে হাতে-কলমে মাঠে-ঘাটে কাজকর্ম করবেন। তা তারা করবে কেন? চাষীর

ছেলেও আজ আর চাষ করতে চায় না। মজুরের ছেলেও মিস্ত্রি হতে চায় না। কেন না মধ্যবিত্ত-সভ্যতার তারাও শরিক হতে চায়। অটোরিক্সা, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর নিয়ে কাউকে দিয়ে ভাড়া খাটিয়ে নিজেরা যেমন কফিহাউস করছিলেন, তেমনি করছেন।

মধ্যবিত্ত দর্শন

এই মধ্যবিত্ত দর্শনের পথিকৃৎ হলো বাংলাদেশ—লর্ড কর্ণওয়ালিসের পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট-এর বিষবৃক্ষের বীজ থেকে উৎপন্ন। জমিদারি প্রথা অনেক দিন উধাও হয়ে গেছে, কিন্তু জমিদারী মনোবৃত্তিটা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে সর্বত্র। ক্ষুধিত পাষাণের অতৃপ্ত আত্মাগুলির মত, 'চেসায়ার ক্যাট'-টি নেই, কিন্তু তার হাসিটি রয়ে গেছে—পঞ্চশরে দগ্ধ করলে কী হবে—সমাজতান্ত্রিক আগুনে—কিন্তু তা বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে! মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অবস্থা আজ ওষ্ঠাগত প্রাণান্তকর হলে হবে কি, ভাবে ভাবনায় চালে বোলে স্বপ্নে এরা সবাই এক একজন ক্রমবর্ধমান বেলুন—যদিও মাথার চুলটি পর্যন্ত দেনায় বিকিয়ে আছে। ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে বাচ্চাদের না পড়ালেই নয়, যারা অতদূর পারে না, বাচ্চাদের হাতে ধরে স্কুলে পৌঁছে দেয়, ছুটি হবার আধ ঘণ্টা আগেই উপস্থিত হয়ে হাতে ধরে নানাবিধ রাস্তাঘাটের সম্ভাব্য-বিপদ আপদ থেকে সুরক্ষিত করে ফিরিয়ে আনে। স্কুলের মাস্টারে অত বিদ্যা মাথায় ঢোকে না দেখে, প্রাইভেট টিউটর রাখতেই হয়। ছেলেদের যাতে কোন কষ্ট না হয়, তার জন্য স্নানঘরে পরিত্যক্ত কাপড় চোপড় ছেলেদের ধুতেও দেয় না, নিজের বিছানাটা নিজে ঠিক রাখাটা সম্মান হানিকর বাজে কাজ বলে উৎসাহিত করা হয়। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত (উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন-বিভোর) মা বাপেরা তাদের সন্তানদের একদম অপদার্থ, অকর্মন্য, কর্মবিমুখ, অসহায়, আহাম্মক করে তুলছেন। এই মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের জীবনাদর্শ কি? শ্রম বিমুখতা, পরনির্ভরতা, ভোগ সর্বস্বতা, বৈঠকী সভ্যতা। উৎপাদন এদের বিবেচ্য নয়, কেবল ভোগ। যাকে 'কন্‌জিয়ুমার্স ফিলজফি' বলে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত—যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, কি খাই, কি পরি, কি দাম, কেন সব পাচ্ছি না—এ জাতীয় নালিশের অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড

এক একটি পরিবার। কিন্তু কোথা থেকে কী তৈরী হয়, কেমন করে হয়, কেন হতে পারছে না—কারা তা তৈরী করে, তারা কিছু খেতে পায় কি না—এসব তাদের ড্রয়িং রুমের আলোচ্য বিষয় নয়। এই সব মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা উচ্চমধ্যবিত্ত তাদের মহিলাদের কার কতখানা শাড়ী আছে তার হিসেব রাখাও তাদের পক্ষে শক্ত—এবং এ খবরও তারা রাখেন না যে গ্রাম্য মহিলাদের—জনমজুরদের মা বোনেরা একখানা শাড়ীর অভাবে আজ ঘরের বাইরেও যেতে পারছে না। মাথায় একটু তেলের অভাবে সকলেরই অবস্থা ও চেহারা প্রায় ভৈরবীর মত। অথচ দেশে সিগারেটের কারখানা বাড়ছে, নাইলনের শাড়ীর ফ্যাক্টরী বাড়ছে, মদের দোকান বাড়ছে, চার-নক্ষত্রের হোটেলের সংখ্যা বাড়ছে, ভোগ ও বিলাসিতার বহর বেড়ে চলেছে। এই উচ্চ মধ্যবিত্তদের জীবনকেই আমরা আমাদের দরিদ্র-মধ্যবিত্তদের ছেলেমেয়েদের আদর্শ বলে স্থির করেছি।

উভ-লিঙ্গ জাতীয় মানসিকতা

এদিকে ইয়োরোপ-আমেরিকার ছেলেমেয়েদের অনেকের মধ্যেই ভোগবাদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে। একটা প্রতিক্রিয়া তার হিপ্পি। কিন্তু ভারতীয় উপুসি নওজোয়ানদের মধ্যে অতৃপ্ত ভোগ-লিপ্সা চোখে মুখে চক চক করছে। হিপ্পিদের মত এখানেও কিছু কিছু ছেলে-মেয়ের ঢং ঢাং দেখা যাচ্ছে—কিন্তু সেটা ইয়োরোপ-আমেরিকার ভোগ-বাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়—বরং তার উল্টো বাসনা থেকে হ্যারমাফ্রোডাইট (hermaphrodite) বা উভ-লিঙ্গ জাতীয় মানসিকতা ও নান্দনিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে—নিজেরই মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ একই সঙ্গে দেখতে পেয়ে এক একটি নারসিসাস মূর্তিমান বা মূর্তিমতী হয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে, নিজের চুল দাড়ির হেফাজত করতেই গোটা দিনমান কাটিয়ে দিচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের কার্যকারিতা ও সম্প্রসারিতা দেখে অবাক হতে হয়। তারাও সাজে পোষাকে হালে

চালে প্রচলিত নটনটীদের থেকে বিভাজ্য নয়। তারা উঠে পড়ে রাজনৈতিক নেতাদের, দলীয় মতাদর্শকারীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, দরিদ্র ভারত সোনার ভারতে পরিণত করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইয়োরোপ, আমেরিকা, রাশিয়ার মত জীবনমান, ও জীবনযাত্রা কায়েম করা মাত্র গুটি কয়েক পঞ্চবার্ষিকী লম্ফ দিলেই সম্ভব হবে। সম্পদের সীমা ও জনবহুলতার হ্যাণ্ডিকাপ তাঁরা মানেন না। কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তির একটা বিশ্বময় সংকট দেখা দিলেও, কয়েক দিন বা মাস বা বৎসরান্তেই তাঁরা এনার্জির নব নব বিকল্পের দিগন্ত খুলে দিচ্ছেন বলে, তবে সেটা তখনই সম্ভব যদি তাঁদের বেতন ও মহার্ঘভাতাদি সহ আয় কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়—তাঁদের উর্বর মস্তিষ্কের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয়। তাঁদের মস্তিষ্ক যে অত্যন্ত উর্বর তার প্রমাণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ তাঁদের এক্ষুনি উচ্চতর মুল্যে কিনে নিতে সর্বদা হাতছানি দিয়ে ডাকাডাকি করছে। আর ব্রেইন-ড্রেনের ভয়ে ভারত সরকার যতদূর পারেন তাঁদের বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করে চলেছেন। তবে এই বুদ্ধিজীবীদের ও তাঁদের স্তাবকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করছে কারা? নিরক্ষর দরিদ্র একবেলা খাওয়া গ্রাম্য দরিদ্ররা। দেশে নিরক্ষরতা, দারিদ্র, অভাব, অনটন যত বাড়ছে, মহানগরীগুলিতে বিভিন্ন ধরণের গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগারের বহুতল গগনচুম্বি সৌধগুলিও তত বাড়ছে—যদিও প্রতিদানে সেই গ্রাম্য দরিদ্রদের দারিদ্র দূরীকরণের কোন একটা আইটেমও তারা আজও পর্যন্ত কিছুই আবিষ্কার করতে পারে নি। কিন্তু এতে এদের অহমিকা কমছে না, বিন্দুমাত্র লজ্জা বা উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় না, কোন প্রকার বিবেক দংশনে তাঁরা ভোগেন না, এমন কি ক্লাসে ছেলেমেয়েদের না পড়িয়ে, প্রাইভেট টিউশনে ও অন্যান্য অনেক রকমের অনাচার ও দুর্নীতির প্রশ্রয় নেন ও দেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা কি দেখছে?

ছাত্র-ছাত্রীরাও দেখছে, পড়ে শুনে আর কী হবে, চাকুরি তো মিলবেই না। চাকুরি মিলতে পারে একমাত্র উমেদারীতে, চামচেগিরিতে। কাজেই নকল করার অধিকারটা খাওয়া-পরার অধিকারের মতই সমার্থক

হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা সত্যিই ভাল বা মেধাবী ছেলে মেয়ে তারাও ভাবছে অত খেটেও তো নকলকারীদের সমান নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়, তবে আর পড়ে শুনেই বা লাভ কি? তাদের মেধা ও প্রতিভা তখন নিযুক্ত হয় পড়া-শোনার বিরুদ্ধেই। পড়াশোনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাকে এক ধরণের বৈপ্লবিক আদর্শে তারা মহিমান্বিত করে তুললো।

যুবসমাজের মনোবৃত্তি

এই সামগ্রিক ভোগবাদী উচ্চমধ্যবিত্ত পরশ্রমজীবী মনোবৃত্তি দিয়ে আমাদের যুবসমাজ ও শিক্ষিত সমাজ আজ পরিচালিত। অথচ দেশের সামর্থ যেখানে এত সীমিত, উৎপাদন যেখানে দিন দিন ক্ষীয়মান, লোকের উৎপাদিকা শক্তি যেখানে এত সামান্য, সেখানে এতবড় লোভ, লালসা ও স্বপ্নের ঠাঁই করা কি সম্ভব? অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই সে ভোগ্যমান জীবনে কায়েম করতে পারে, বেশীর ভাগকে হতাশ হতেই হবে। ফলে এদের মধ্যে লেগে যায় কাড়াকাড়ি মারামারি—ঐ সীমিত উপভোগ্যটুকু দখল করার জন্য। ফলে ছেলেরা ভাগাভাগি না হয়ে পারে না, কখনই একদল হতে পারে না, কেবলই খণ্ড খণ্ড উপদলে বিভক্ত হতে বাধ্য। কেউ এদল, কেউ ওদল, আর একই দলের মধ্যে নানা উপদলে বিভাজিত হচ্ছে—এবং লাঠি-সোটা, হাত বোমা ইত্যাদির সাহায্যে জবর দখলের লড়াইতে নেমেছে। এই একই যুবসমাজ, (যাকে সব দল youth-power মনে করে হস্তগত করার জন্য ব্যস্ত), কখনও সি, পি, এম, কখন সি, পি, আই, কখনও যুব কংগ্রেস, কখন যুব ফেডারেশন, কখনও নক্সাল নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। ব্যর্থ হয়ে, শেষ পর্যন্ত সমাজবিরোধী, এমনকি ছিনতাই পার্টিতেও যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে। এঁরা আজ সমাজে উদ্বৃত্ত, অনভিপ্রেত—এমন কি বাপ মায়ের কাছেও আতঙ্ক-বিশেষ। এঁরা একটা বিশেষ সভ্যতার অবান্তর আবর্জনা মাত্র—ইতিহাসের ডাস্টবিনের মশলায় পরিণত হতে চলেছে। পরস্পর মারামারি করে যদুবংশের মত ধ্বংস হবার পথে এরা অগ্রসর হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, সভ্যতা বলতে এই মধ্যবিত্ত-সভ্যতা ছাড়া পৃথিবীর

সক্রিয় সমাজবাদীরা ও দার্শনিকেরা বাস্তবে অন্য কোন সভ্যতা আবিষ্কার করতে পারেন নি। সাম্যবাদী দেশে 'প্রোলেটকাল্ট' বলে এক সাম্যবাদী সমাজ, সাম্যবাদী মূল্যবোধ বা অন্য কোন জীবনায়ন স্থাপিত হবে—এই ছিল এককালের স্বপ্ন ও আদর্শ, Utopian ও Scientific Socialist ও Anarchism-এর প্রবক্তাদের কাছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র এখন আমেরিকান ভোগবাদের আয়নায় নিজেদের মূল্যায়ণ করতে সুরু করছে। একদা মহাত্মা গান্ধী ভিন্নতর বা বিকল্প জীবনাদর্শ ও মূল্যমান সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন, জনবহুল আমাদের এই দরিদ্র দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিকে লক্ষ্য রেখে।

পণ্ডিত নেহেরুর বিজ্ঞানবাদ ও সমাজতন্ত্র, কম্যুনিস্ট মতবাদী দলসমূহ, প্রগতিবাদী মধ্যবিত্তদের দৌরাত্ম্যে ও অহমিকায় গান্ধীকে একটা বোকা বৈরাগী বলে এদেশ থেকে বিদায় করা হয়। সকলের জন্য মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের যোগানের অগ্রাধিকারকে অস্বীকার করে সবাই মিলে, ধনকুবেরদের পরোক্ষ দালালি ও পয়সায়—গান্ধীবাদকে এদেশ থেকে ঠাট্টা করে শিকেয় তুলে রাখা হয়। যদি কোথাও এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সমসমাজের আদর্শের এখনও কোন লড়াই চলে থাকে—সে কেবল একমাত্র চীন দেশে—যেখানে বছরে এক জোড়া পানতালুন ও কোর্তাতেই সবাইকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু এদেশে যারা মাও-সে তুং-পন্থী কম্যুনিষ্ট বা নকশাল আছেন বা ছিলেন তাদের ব্যক্তি জীবনের মূল্যবোধ চৈনিক নয়, তাদেরও চালচলন হাবভাব পোষাক-আসাক ও দৈনন্দিন জীবন একই মধ্যবিত্তসুলভ ভোগবাদী।

স্বাধীনতার পরেও

স্বাধীনতার পরেও, এই দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, বেকারী, অন্যায় অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বারে বারে প্রতিরোধ, আন্দোলন, বিদ্রোহ এমন কি বিপ্লবের কম চেষ্টা হয়নি, বিভিন্ন বিরোধী ও বিপ্লবী দল উপদলের তরফ থেকে। ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়াবার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কম ট্রাম-বাস জ্বালানো হয়নি, গুলীগোলা খাওয়া কম হয়নি। গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক বৈপ্লবিক সব রকমই বিদ্রোহ করার চেষ্টা করা

হয়েছে। এমনকি কংগ্রেসও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু সব বিদ্রোহই আজও পর্যন্ত ব্যর্থ। বিদ্রোহীরা প্রায় সবাই ক্লান্ত। পরাজিত মনোভাব সর্বত্র বিরাজিত। আজ মানুষের এত অভাব, এত অনটন, এত বেকারী, এত মূল্যবৃদ্ধি, এত দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কোন প্রকার সত্যিকার বিদ্রোহ গড়ে উঠছে না।

সত্যিকার বিদ্রোহ হচ্ছে না কেন?

কেন? তার একটিই মাত্র কারণ দেখতে পাচ্ছি। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং যারা বিদ্রোহী—উভয় পক্ষই একই শ্রেণীর, একই আদর্শের লোক। সামগ্রিক মূল্যবোধ একই—সেই মধ্যবিত্ত ভোগবাদ। একদল চোর, অপর একদল চোরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেমন চুরি-প্রথার অবসান ঘটাতে পারে না, একদল ডাকাত অপর ডাকাতদলের সঙ্গে লড়লেই যে সমাজ থেকে ডাকাতি তুলে দিতে পারে না, তেমনি একদল মধ্যবিত্ত অপর মধ্যবিত্ত দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে মধ্যবিত্ততন্ত্রের অবসান করতে পারে না। এদের মধ্যে তুলনা হতে পারে, তুল্যবোধের হেরফের হতে পারে, কিন্তু গুণগত Contrast কিছু সৃষ্টি হয় না,— এমনকি নেতিবাদী নক্সালতন্ত্রের জীবন কাঠি যদি মধ্যবিত্তদের ছেলেমেয়েরাই হয়— তাতেও শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ নিজস্ব মধ্যবিত্ত সীমার জন্য পরাজিত হতে বাধ্য।

বন্দুকের নলের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক বিপ্লব বা পরিবর্তন ঘটতে পারে, এই বিশ্বাসে যারা এখান সেখান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া গোটা কয়েক বন্দুক পিস্তল নিয়ে নক্সালবাড়ী বা অন্যত্র ভূমিহীন কৃষক দিনমজুর ও গরীব চাষীদের বিপ্লব আনতে চেষ্টা করেছিলেন, তারা কারা? কিছু বিদ্রোহী মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েরা। দেশের অগুন্‌তি দরিদ্র গ্রামবাসীদের এই ভদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের আমদানী করা কয়েকটা বন্দুক ও পিস্তল দিয়ে সত্যিই শেষ পর্যন্ত শক্তিমান করা যায়, না গিয়েছিল? দিনকয়েক একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায়, এবং গিয়েও ছিল, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই পাল্টা সন্ত্রাস সসৈন্যে নেবে এলো, মধ্যবিত্ত নক্সাল বিপ্লবীরা সেই গ্রাম্য দরিদ্রদের মোটেই রক্ষা করতে পারলো না, তাদের ত্যাগ করে পালাতে

হলো, নয়তো প্রতিক্রিয়ার হাতে প্রাণ দিতে হলো—নেবে এলো বিপ্লবের নামে গ্রামদেশে প্রতিবিপ্লব। কতকটা কম তীব্র আকারে ও প্রকারে যুক্তফ্রণ্টের আমলেও একটা গণসন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, দরিদ্র চাষীরা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আজ তাদের কোথাও মাথা তুলবার সাহস নেই। নব কংগ্রেসী এই আমলে যুব কংগ্রেসীদের আস্ফালনেও আজ গ্রামের ভাগচাষী তার ন্যায্য অধিকার দাবি করতে সাহস পায় না, ভাগচাষী-উচ্ছেদ বন্ধ হয় না। গ্রাম্য গরীবেরা বুঝেছে যে এই যুবশক্তি (Youth Power) যে নামেই তাদের কাছে উপস্থিত হোক না কেন, তারা নির্ভরযোগ্য নয়, তারা তাদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে না, কেন না তারা যে সবাই ভিন্ন জাতের বা ভিন্ন শ্রেণীর লোক—ভিন্ন আদর্শের লোক, মধ্যবিত্তদেরই নানা সংস্করণ।

এই মধ্যবিত্ত সমাজ

এই মধ্যবিত্ত সমাজ ও তার আদর্শ দিন দিন প্রসারিত বই সংকুচিত হচ্ছে না, যদিও ভিতরে ভিতরে অন্তঃসারশূন্য, দরিদ্র, শূন্যগর্ভ হয়ে গেছে। তার কারণ আমরা আজও পর্যন্ত এই মধ্যবিত্ত সভ্যতার বিকল্প অন্য কোন সভ্যতার জন্ম দিতে পারিনি। গ্রামে যারা অপেক্ষাকৃত কম দরিদ্র বা মোটা চাষী তারাও চান না তাদের ছেলেরা চাষী বা চাষাই থাকুক, তারাও ভদ্রলোক হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সহরের শ্রমিকদের বেলাতেও তাই। এত যে স্কুল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে ও বাড়ছে—তারও পিছনে আছে সবাইকে মধ্যবিত্ত হবার তাগিদ। আর এই মধ্যবিত্ত মানে—শ্রমবিমুখ, বাবুতান্ত্রিক, কৃষক-বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী, দুর্নীতিজীবী, পরশ্রমজীবী হবার তাগিদ। উৎপাদন কর্ম থেকে যত দূরে থাকা যায়, তার চেষ্টা। এই মধ্যবিত্তবাদ হুহু করে বেড়ে চলেছে, সমাজের সর্বস্তরে তারাই হলো হালচাল-নিয়ামক, তারাই রাজনীতি, অর্থনীতি, কলা, শিল্প সব কিছুর pace setter। এরাই বুদ্ধিজীবী, এরাই দার্শনিক, এরাই অধ্যাপক, নান্দনিক, বিচারক, পণ্ডিত, সাংবাদিক, সম্পাদক, নেতা ইত্যাদি ইত্যাদি। একদা লেনিন বলেছিলেন, বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেও

পাতি বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া মনোভাব প্রতি মুহূর্তে লক্ষে লক্ষে জন্মাচ্ছে, আবার প্রতি মুহূর্তেই লক্ষে লক্ষে পরাজিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখানেও তাই প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি মধ্যবিত্তের সোনালি স্বপ্নের জন্ম ও মৃত্যু ঘটছে। কিন্তু এই মৃত্যু থেকে মধ্যবিত্ত স্বপ্নের মৃত্যু হচ্ছে না, যেটা ঘটছে সেটা হতাশার একটা বিরাট অসন্তোষের সমুদ্র—যে অসন্তোষে তাপ আছে, ধোঁয়া হয়, কিন্তু সত্যিকার আগুনও জ্বলে না, আলোতো হয়ই না।

সব দলই—মধ্যবিত্তের দল

কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সমাজটা ওজনে ও সংখ্যায় কতটুকু ? এই বিরাট দেশের শতকরা দশভাগও নয়। এই দশভাগ লোক তাদের জীবনমান রক্ষা করতে আজ হিমসিম। এরাই দুর্নীতির ধারক, বাহক ও পোষক। দুর্নীতির জন্ম হয়, আয়ের চেয়ে ব্যযের বহরটা বাড়ানো হলে, যোগ্যতা বা ক্ষমতার চেয়ে আকাঙ্ক্ষাটা যদি বেশী আগ্রাসী হয়। তখন তার দুর্নীতিগ্রস্ত, অনুগ্রহ-ভিক্ষুক, স্তাবক, মিথ্যাচারী, ভণ্ডতপস্বী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। মধ্যবিত্তের ড্রইংরুম দেখলেই এই দুর্নীতির মূর্ত-রূপটি ধরা পড়ে। ব্যক্তি জীবনে দুর্নীতির মূল যেমন এমনি, দেশের জীবনে দুর্নীতির মূল কারণও একই। আমাদের দেশের যা সত্যিকার সম্পদ ও শক্তি তার বাইরে যদি ইয়োরোপ আমেরিকান জীবনমান দাঁড় করাতে যাই—তবে গোটা দেশটাকে দুর্নীতিগ্রস্ত গঠনচিন্তার উপর দাঁড় করাতে হবে। আমদানি-রপ্তানির অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির বুনিয়াদকে শক্ত করার চেষ্টা হবে। দেশের যাবতীয় মৌলিক সম্পদের বিনিময়ে কতিপয় উচ্চ-মধ্যবিত্তের জীবনমানের প্রয়োজনে আমদানি-রপ্তানি নীতি পরিচালিত করতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎকে বিক্রি করে দিয়ে, বর্তমানের আগ্রাসী লোভ চরিতার্থ করার ঝোঁক বাড়বে। দেশের ভারী ভারী অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতদের মোটা বেতনে কিনে নিয়ে এই সর্বনাশা বৈদেশিক বাণিজ্যনীতির গুণকীর্তন করানো হবে। এবং হচ্ছেও তাই। এবং এসব বিষয়ে সব দলেরই প্রায় একই মত—কেন না সব দলই আসলে একটিই দল—মধ্যবিত্তের দল।

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও এই দলটা সত্যিই কত বড়? এরা কি ইতিহাসের চেয়েও বড়? দেশের চেয়েও বড়? পৃথিবীর চেয়েও বড়? এদের শক্তি সত্যিই কতটা? এরা পারমাণবিক বোমাধারী হলেও সত্যিই কতটা শক্তিধর? এরা বাকী নব্বুই ভাগ লোককে কতকাল কতদিন পর্যন্ত দাবিয়ে রাখতে পারবে? কেন পারছে এখনও? তার কারণ বাকী নব্বুই ভাগ গ্রাম্য দরিদ্র লোকদের এবং সহরের বস্তিবাসীদেরও এরা একটা মধ্যবিত্ত সমাজের স্বর্ণমৃগ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আর বেশীদিন পারছে না। ধাপ্পাটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুরো ধাপ্পাটা ধরতে পারছে না, যখন তারা দেখে এই মধ্যবিত্তদের 'যুবশক্তি'দের এক একটা অংশ কখন কখনও একটা পতাকা, নয়তো একটা বোমা বা একটা পিস্তল বা একটা মিছিল নিয়ে তাদের উদ্ধার করার জন্য উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সংগ্রামের ধাপ্পাটা জনসাধারণকে এখনও বুঝতে একটু বাকী আছে। একটা সংগ্রাম সত্যি দরকার—কিন্তু সে সংগ্রামের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার বোমা পিস্তল নয়। বোমা পিস্তলের উপর নির্ভরশীল যে সংগ্রাম, সে সংগ্রাম কন্ট্রোল করবে মধ্যবিত্ত ব্যবসাদারী সমাজই। যদি সত্যি দরিদ্রদের শক্তিমান করে তুলতে হয় তবে, প্রথমেই তাদের শ্রমবিমুখ, ভোগবাদী, কপটাচারী মধ্যবিত্ত সমাজকে ঘৃণা করতে শেখাতে হবে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা হালচাল ফ্যাসন সব কিছুকে থুথু দিয়ে পরিত্যাগ করার সাহস অর্জন করতে হবে। "না" বলবার সাহসটা অর্জন করতে হবে। গান্ধী বলেছিলেন, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিমান রাষ্ট্র বা সমাজ থাকতে পারে না, যা জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ অসহযোগিতাকে উপেক্ষা করে এক সপ্তাহও টিকে থাকতে পারে। এই "না" বলার শক্তি, এই অসহযোগিতা করার শক্তি যদি দেশের জনসাধারণ আবার ফিরে পায়, তবে তাদের আর কোন অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে না। মধ্যবিত্ত সভ্যতার পারমাণবিক বোমা, পর্বতপ্রমাণ পুঁথিপত্র, অগুনতি পণ্ডিতমূর্খের ফাঁকা বেলুন একমুহূর্তে চুপ্‌সে এতটুকু হয়ে যাবে।

তোমাদের যুবশক্তি

তোমাদের যুবশক্তি? Youth power? হায় এই যুবশক্তির উপরে লোভ সব দলের। এমনকি জয়প্রকাশ নারায়ণের পর্যন্ত। এই যুবশক্তি যতটা চক চক করে ততটা সৎপদার্থ নয়, যেমন যা ই চক চক করে তাই সোনা নয়। এই যুবশক্তি বা youth power বা ছাত্রশক্তি একদা দেশে দেশে নানাধরণের বিদ্রোহ ও সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল—গত কয়েক বছরে। বিপ্লবের বাহন শ্রমিকশ্রেণী যখন কায়েমী স্বার্থের বা Establishment-এর শরিক হয়ে পড়লো, এবং চাষীদের বিদ্রোহ কোন ধারাবাহিক সংগ্রামে দানা বেঁধে উঠতে পারলো না, উপরন্তু, দেশে দেশে স্বৈরতন্ত্রী ডিক্টেটারী শাসন গ্যাট হয়ে বসে সকল প্রকার বিপ্লব ও বিদ্রোহ ভাবনাকে উপহাসের বস্তু করে তুললো, তখন ইতিহাস ছাত্র ও যুবকদেরই সাহায্যে এক ধরণের বিদ্রোহ সংঘটিত করে দিলে। ফরাসী-দেশে বেন কোহেনের নেতৃত্বে স্বয়ং 'গু গল'-কে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করে বসলো। বেন কোহেনের মধ্যে নতুন ধরণের বিপ্লবের আভাস সবাই দেখতে পেলো। ছাত্র ও যুব সমাজকে নতুন চোখে দেখতে চাইলো সবাই—বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তরা সহ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেন কোহেন কোথায় ডুবে গেলেন? তিনি এখন কোথায় আছেন, কী করেন সে সংবাদ খবরের কাগজেও পাওয়া যায় না। ফরাসী বিদ্রোহী ছাত্র সমাজ শেষ পর্যন্ত দাবী করে বসলো—ছাত্রী আবাসের মেয়েদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করার অধিকার সোর্বর্ণের মত বিশ্ববিদ্যালয়কেও দিতে হবে। দিতেও হয়েছিল। এই হলো ছাত্র ও যুবসমাজের চূড়ান্ত রূপ। এটা ব্যতিক্রম নয়, এটা কেবল ফরাসী যুবসমাজের চিত্র নয়—এই আদর্শই আমাদের পিছিয়ে পড়া দেশের ক্ষীণজীবী যুব সমাজের বুকের অন্তরালে লুকিয়ে আছে। এই শক্তিকে নির্ভর করে, কি কংগ্রেস, কি কম্যুনিষ্ট, কি নকসাল, কী জয়প্রকাশ নারায়ণ কতদূর যেতে পারবেন? ইতিমধ্যেই জয়প্রকাশ নারায়ণ খবরের কাগজে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেছেন, তার নাম করে লক্ষ্ণৌতে, কাশীতে, পাটনায় ও অন্যত্র জোর করে চাঁদা আদায় হচ্ছে। এ কেবল জয়প্রকাশের যুবশক্তিরই পরিচয় নয়। এটা সব দলেরই চাঁদা আদায় করার নামে জুলুমবাজীর সাধারণ

এক নিদর্শন। এই অন্ধ যুবশক্তি, ভোগবাদী যুবসমাজ, কখনো কখনো পতাকা হাতে মিছিল করতে পারে বটে, ঘেরাও করতে পারে বটে, আবার লুটতরাজ, ছিনতাই, জোরজুলুম, দাঙ্গাবাজীও করতে পারে। সৎকাজে চাঁদা আদায়ের নামে হাতখরচ তোলার রেওয়াজ এই বেকার যুবসমাজের আজ স্বভাবসিদ্ধ এক ব্যবহার।

যুবসমাজের প্রতি

বাংলার যুব সমাজ, উপরে তোমাদের যে বর্তমান অসহায়, অপদার্থ, অর্বাচীন, অকর্মন্যরূপকে আমি এমন আক্রমণ করেছি, আমি জানি, এটাই যুব সমাজের একমাত্র রূপ নয়, অন্য একটা দেবদুর্লভ রূপও তোমাদের মধ্যেই আছে। কিন্তু সেরূপকে তোমাদের নেতারা কখনো বিকশিত করতে সাহায্য করেনি। সে রূপের পরিচয় ও বর্ণনা ও তার বিপুল সম্ভাবনার কথাও আমি পরে বলছি। তার পূর্বে তোমাদের বর্তমান দুর্বল ভীরু ভালগার রূপ ও তার শক্তি বা অপশক্তি সম্বন্ধে—যার উপরে নির্ভর করে সব রাজনৈতিক দলগুলি তোমাদের নির্মমভাবে ব্যবহার করে চলেছে—তার আরও কিছু বর্ণনা শুনে নাও।

যাদের আদেশে আজ তোমরা মজুত উদ্ধারের জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য উদ্যত হয়েছো, সেটা কোন অধিকারে? এ আদেশ তো তোমাদের উপরে নতুন করে আসেনি। লেভী আদায়, মজুত উদ্ধার, ইত্যাদির জন্য যুব কংগ্রেস, যুব ফেডারেশন, যুবসংঘ ইত্যাদির উপরে নিয়মিতভাবে আদেশ ইতিপূর্বে বহুবারই কি যায়নি? সে আদেশ তোমরা শুনেছিলে কোন দিন? যারা এই আদেশ দিতেন সেই এম. এল. এ-রাও অনেকেই নিজেদের দেয় লেভীও সরকারকে দেয়নি, একখবর তো জানো। জানো, এসব নেতারা দু-মুখো—কোলকাতায় বসে যে-প্রতিজ্ঞা ও আস্ফালন করেন, গ্রামে গিয়ে ঠিক তার উল্টোটা বলে থাকেন, একখবর তোমরা জানো না? তোমাদের মধ্যে অনেকেই কি জোতদার মহাজন ও উঠ্‌তি বুর্জোয়ার সন্তান সন্ততি নও? মজুত উদ্ধারের নামে ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত শত্রুর কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে অর্থ করে নিয়েছে এমন খবরও সর্বজনবিদিত—তাছাড়া অনেকেরই

হাতখরচ (যারা একটু মদ্যপ—তাদের মদের খরচও) এই মজুত উদ্ধারের নামে সংগ্রহ করা হয়নি কি ? আজ যে নতুন করে তোমরা ঘোর প্রতিজ্ঞা বা শপথ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঝাপিয়ে পড়বার প্রস্তুতি নিচ্ছ, সেটারই বা দৌড় কতটুকু তাকি তোমরা বোঝ না ? যুক্তফ্রণ্টের আমলেও তোমরা জোতদারের জমিতে ধান কেটে আনার আদেশ দিয়েছিলে, কিন্তু সে ধানের হিসাব শেষ পর্যন্ত দিতে পারনি, মনে আছে সে কথা ?

ইতিমধ্যেই মজুতদাররা

আর তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছো, তোমরা কি নেকড়ের দল, না সুন্দরবনের বাঘ ? সুন্দরবনের বাঘও যদি হও, তাহলেও তোমরা সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘ নও, মাছ কাঁকড়া খাওয়া কেঁদো বাঘ, রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়। কোন্ সাহসে, কোন অধিকারে, কার জোরে, কোন্ রাজনৈতিক স্ট্রাটাজী ও ট্যাকটিকসের কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়বে ? পূর্বেই বলেছি, গ্রাম্য জোতদার মহাজন মজুতদারেরা ইতিমধ্যেই গ্রাম্য ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, বেকার দিন মজুর ও তাদের ছেলে, মেয়ে, শিশু সবাইকে হাত করে ফেলেছে। এম-আর সপের লোভনীয় প্রস্তাব তারা বর্জন করে গ্রাম্যধনীদেরই ফাঁদে পা দিয়ে বসে আছে। তোমাদের রাজনীতি, তোমাদের সরকারের আইন কানুনের উপরে তাদের এতটুকু ভরসা নেই, কেন না তোমরা তাদের বাঁচাতে পারো না, বরং প্রাণভয়ে পালিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পাবে না, যদি গ্রামগুলিকে আক্রমণ করতে যাও। কিছু পেটো বা পাইপগান দিয়ে লক্ষ লক্ষ গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি তোমাদের কিছুমাত্র নেই। তাছাড়া তোমাদের কোন বক্তব্যও নেই, আদর্শও নেই, চরিত্রও নেই, ত্যাগও নেই। একবার গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখোগে, তোমাদের দুর্দশার কী হাল হয়, পালাবার পথ পাবে না বলে দিচ্ছি। তোমাদের যারা গ্রাম্য উঠ্তি যুব সমাজ, তারাও তোমাদের পেছন থেকে ল্যাং মেরে কাদায় ফেলে মার খাইয়ে দেবে।

খেয়াল রেখো

জানি খুঁটোর জোরে ভেড়া কোঁদে। পুলিশ-সি-আর পিও শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী তোমাদের পেছনে থাকবে, মনে মনে এই ভরসা

রাখ। পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনী ও সৈন্য বাহিনীকে অতটা বিশ্বাস করো না, অতটা ভরসা রেখো না, যে তোমাদের সকল প্রকার উৎপাতে সব সময় তোমাদের তারা রক্ষা করে যাবে। পুলিশও ঘুষ খেতে জানে, সি-আর পিও কিছু যুধিষ্ঠিরের দল নয়। তাছাড়া পুলিশও আজ রাজনীতি বোঝে, অর্থাৎ দলাদলি বোঝে। তোমরা যেহেতু একদল নও, একমত নও, এককাট্টা নও, তোমাদের একদলকে বসিয়ে দিয়ে অপর দলের সাহায্যে তারা তাদের কর্তব্য বেশ অবহেলায় করতে পারবে—যেমন আজও করে চলেছে। পুলিশ গায়ে পড়ে কোন হাঙ্গামায় যাবে না, পুলিশ তোমাদের হাতেও কম নাজেহাল হয়নি, হয় না—তোমাদের দাদাদের বদৌলতে। তারাও ক্ষেপে আছে। অবসর মত তোমাদের ফেলে চম্পট দিতে তাদের কিছু মাত্র বাধবে না। তাছাড়া একথা জেনে রেখো, এই সব পুলিশ, সি-আর পি, সৈন্যবাহিনী এরা অনেকেই সাধারণ কৃষকের সন্তান, গরীবের ঘরের ছেলে, নেহাৎ পেটের দায়ে তোমাদের তাঁবেদারি আর বিবেকহীন আদেশ মানতে বাধ্য হচ্ছে। লেবু অতিশয় কচলালে যেমন তেতো হয়, ওদেরই বাড়ী ঘর মা বোনের অত্যাচার ওদেরকে দিয়েই চিরকাল করানো সম্ভব হবে না। অতএব তোমরা যে খুঁটোর জোরে কুঁদে বেড়াচ্ছো, বীভৎস হাঁকডাক আর "যুগ যুগ জীও জীও" করে গর্দভনিনাদ করে চলেছো—নিজেদের অন্তরের ভয় ও ত্রাসকে ঢাকবার জন্য—সেদিকে একটু খেয়াল রেখো—বেহিসেবী হয়ো না।

কোন অধিকারে ?

আর গ্রামে গ্রামে মজুত উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে, কোন্ অধিকারে ? তোমরা, অথবা তোমাদের নেতারা, অথবা তোমাদের এম. এল. এ-রা বা মন্ত্রীরা ক'জনা চাষীদের চাষবাস কেমন কেমন হচ্ছে, কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে, কে জল পেলো কি পেলো না, কারা কারা সার বীজ পেলো না, মূলধন পেলো না, কার কী অসুবিধা মাঠে মাঠে ঘুরে চাষীভাইদের কখনো কোন কিছু জিজ্ঞেস করেছো ? কেন ব্যাঙ্ক থেকে শতকরা ৮০টা লোক কোনই ঋণ পেতে পারে না, কেন মহাজনের কাছে ফসল ওঠার পূর্বে দাদনের জন্য ফসল বিক্রি করে দিয়ে বসে আছে,

কেন মহাজনদের কাছ থেকে ১০০/১৫০% সুদে টাকা নিতে হয়, কেন ছোট চাষী দিন দিন ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে—তা ঘরে ঘরে গিয়ে কখনো জিজ্ঞেস করেছো? পিকনিক করতে, অথবা ভোট সংগ্রহ করতে মাঝে মাঝে গ্রামে হয়তো গিয়েছো, কিন্তু গ্রামের মানুষের দুঃখ বুঝতে চেষ্টা করোনি। বরং গ্রামকে তোমরা ঘৃণা করো, চাষীদের তোমরা চাষা বলো, মূল্যহীন নোট ছড়িয়ে তাদের শিশুদের জন্য যেটুকু দুধ আছে তাও কেড়ে নিয়ে এসে শহরে বসে ভীমনাগের সন্দেশ খেতে ভালবাসো। গ্রামের পুকুরগুলি কেন হেজে মজে যাচ্ছে, মাছের চাষ কেন কমে যাচ্ছে, গ্রামে কেন হালবলদের গরু যথেষ্ট নেই, গরুর কেন খাবার নেই, সে খবর কখনো নেবার চেষ্টা করেছো? আহা, সম্প্রতি তোমাদের জ্ঞান দেবার জন্য নিরক্ষরকে সাক্ষর করার অভিযানে লেগেছো। নিজেরাই প্রথমে একটু লেখাপড়া শেখো, নকল করা বিদ্যার অহঙ্কার ছাড়ো, কিছু অর্থনীতি, রাজনীতি, দেশ, সমাজ সম্বন্ধে এবং চাষ বাস পশুপালন, মৎস্যচাষ, কৃষি বিষয়ক আইন কানুন ইত্যাদি বোঝো। তোমরা ওদের কি শেখাবে? তোমাদের অনাচার দুর্ব্যবহার, শ্রমবিমুখতা, আলস্যপরায়ণতা, দুর্নীতি এসব শেখাতে যেয়ো না। এ বিদ্যার কোন দরকার নেই, তোমাদের সঙ্গে মাননীয় অধ্যাপকরা থাকলেও ওসব জ্ঞান দিতে যেয়ো না, কেননা তোমাদের অধ্যাপক মহাশয়েরাও কিছুই জানেন না। গ্রামবাসীদের তোমরা তোমাদের টেরিলিন টেরিকট, আর সিল্কের জামা ও চমকপ্রদানকারী রঙ বেরঙয়ের শাড়ী, লম্বা ঝুঁটি আর জুল্‌ফি দেখাতে যেও না। গ্রামবাসীরা তোমাদের বেশী দিন সহ্য নাও করতে পারে।

যদি সত্যি যাও

যদি সত্যি যাও, ঝাঁটা নিয়ে যেও, রোজ ভোরে গ্রাম্য অলিগলি-গুলিকে ঝাড় দিও, গোয়ালগুলি ও গোবরের আঁস্তাকুড়গুলি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কাজটা নিতে পার, পায়খানা বানিয়ে দিয়ে আসতে পার, দরকার হলে ক্ষেতে নেবে ধান পুঁতে সাহায্য করতে পার, দেখো যেন

চোংগা প্যাণ্ট আর রঙীন শাড়ী নিয়ে কাদায় নেবে গ্রামীণ কামীনদের চরিত্রভ্রষ্ট করতে যেও না।

চাষবাসের বেলায় এতটুকু সাহায্য করার নাম নেই, কিন্তু ফসল কেড়ে নেবার সময় জোট বেঁধে সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে? তোমরা কি লুটেরা, না ভাড়াটিয়া গুণ্ডার দল?

ঝাঁপিয়ে যদি পড়তে চাও, যাও না দুর্গাপুরের ফার্টিলাইজার কারখানার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কেন আজ তারা দশবছর ধরেও একটা সারের কারখানা চালু করতে পারলো না? পড়ো ওদের ঘাড়ের উপর। বলো ৬ মাসের মধ্যে পুরোদমে সার করবে নইলে তোমাদের ঝেঁটিয়ে তাড়াবো, কারো চাকরি রাখা হবে না, ম্যানেজার থেকে, ইউনিয়ন নেতা থেকে, বদমায়েস কুলি—কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। পুরুলিয়া ও দুর্গাপুরে দুটি সিমেণ্ট কারখানা হবে বলে গত ৩।৪ বছর ধরে গালগল্প বা ধাপ্পা যারা দিয়ে বেড়ায়, তাদের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছো না কেন? এই রাজ্যে একটিও কেন সিমেণ্ট কারখানা হয়নি, একটিও সারের কারখানা হয়নি; একটিও ট্রাকটার টিলার পাম্প সেটের কারখানা হয়নি কেন—এর জন্য দায়ী যারা তাদের ঘাড়ে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ো। তবে তো গ্রামবাসীরা তোমাদের গ্রহণ করবে। হিন্দুস্থান মোটরস থেকে বিড়লারা প্রতিদিন চার থেকে পাঁচশত করে অ্যাম্বাসেডার গাড়ী বের করে দেয়, কিন্তু তাদেরকে দিয়ে ট্রাক্টার, টিলার, রোডরোলার এসব গ্রাম গঠনের ও উন্নয়নের যন্ত্রপাতি করাতে কেন বাধ্য করছো না? কেন না, হে মধ্যবিত্ত বাবু সন্তান-সন্ততিরা! তোমাদের যে প্রত্যেকেরই অ্যাম্বাসেডার না হলে গণ-সংযোগ করার প্রোগ্রাম পর্যন্ত নেওয়া চলে না। তোমরা হাঁটতেও ভুলে গেছো। কোন কিছু কাজ দিলেই, হয় অ্যাম্বাসেডার, নয় জীপ, নয়তো ওয়েগন কেরিয়ার গাড়ী চাই-ই চাই।

কেন ঝাঁপিয়ে পড়ছো না!

ধনকুবেররা কোলকাতার মত এমন ভেঙ্গেপড়া, অতলে তলিয়ে যাবার জন্য উন্মুখ মহানগরীতে যে আকাশচুম্বি বহুতল অট্টালিকা সাহেব পাড়াতে ডজন ডজন উঠাচ্ছে, সেখানে কেন ঝাঁপিয়ে পড়ছো না, চুন্নি

করা সিমেণ্ট, লোহার রড, ঘুষের দুর্নীতির কালোটাকার ইমারতগুলির উপর নজর পড়ছে না কেন ? ঐ সব সিমেন্ট, রড-সিট-লোহা সব তুলে-নিয়ে, গাড়িগুলিতে চাপিয়ে গ্রামে যাও, গ্রামের লোকদের বলো, তোমাদের জন্য সিমেণ্ট এনেছি, রড এনেছি, লোহালক্কড় এনেছি, ট্রাকটার এনেছি, রাসায়নিক সার এনেছি। দেখবে গ্রামবাসীরা তোমাদের দুহাতে অভ্যর্থনা করে নেবে, পেট ভরে খাওয়াবে, মজুত উদ্ধারের জন্য কোন জুলুমবাজীর দরকার হবে না, পুলিশ লেলিয়ে দিতে হবে না।

তোমাদের কী উপকার হবে ?

কোলকাতায় পাতাল রেল বা মেট্রো হলে, তোমাদের কী উপকার হবে, একবার ভেবে দেখেছ ? কোলকাতাটা কি আজও তোমাদেরই আছে না কি ? নিজবাসভূমে কবে পরবাসী হয়ে গেছো খেয়াল আছে ? পাঁচ-সাত বছর পরে যখন সত্যি সত্যি পাতাল রেলটা হবে, তখন দেখবে কোলকাতায় বুভুক্ষিত নরনারী, গ্রাম থেকে উৎপাটিত উদ্বাস্তু নরনারীর সংখ্যা কতগুণ বেড়ে গেছে—পাতাল রেলে ট্রাফিকের কোন সুবিধা হয় নি। কোলকাতা সহরকে বাঁচাতে হলে, বা তাকে বাসযোগ্য রাখতে হলে আগে কোলকাতা মহানগরীর (ঔপনিবেশিক নগরী) চার পাশে কয়েকটা রাজ্যব্যাপী যে পশ্চাৎ-দেশ আছে, সেই হিনটারল্যাণ্ডের গ্রামগুলিকে আগে বাঁচাও, স্বপ্রতিষ্ঠ করো। ভোগসর্বস্ব এই নগরীকে ঢেলে নতুন করে গড়ে তোলো। এটাকে কনজিয়ূমার্স সিটি থেকে, ঔপনিবেশিক নগর থেকে, উৎপাদন ভিত্তিক সহরে পরিণত করো। কৃষিকে আধুনিক করার জন্য, উন্নত ধরণের চাষাবাদ করার জন্য যে যান্ত্রিক সাহায্য ও রাসায়নিক উপচারের দরকার তা আমাদের শিল্পকে তৈরি করতে বাধ্য করো, তার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো।

খবরদার !

গ্রামগুলির উপর আর ঝাঁপিয়ে পড়তে যেও না। খবরদার ! তাতে ফল হবে এই যে কোলকাতার বিরুদ্ধে সারা পূর্বভারতের ও সারা পশ্চিম-বাংলার সকল গ্রাম ক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। কোলকাতা বনাম গ্রাম বলে একটা

অদ্ভুত অস্বাভাবিক যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। তাতে কোলকাতা তো না খেয়েই মরবে, অতলে ডুবে যাবে—যেমন তাম্রলিপ্ত মাটির তলায় লুপ্ত হয়েছিল, যেমন মহেঞ্জোদরো মাটির তলায় ডুবে গিয়েছিল, অথচ গ্রামগুলিরও ভাল হবে না। একটা অন্ধ সংগ্রাম হবে মাত্র। যেটা দরকার সেটা হলো অতি সত্বর কোলকাতাকে গ্রামদেশের প্রয়োজনে যা দরকার সে সব শিল্প দিয়ে পুনর্গঠিত করে তোলা, কোলকাতার ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন, কৃষির সঙ্গে শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপন করা, সহর ও গ্রামগুলিকে পরস্পরের পরিপূরক করে তোলা। কোলকাতার বর্তমান হনুমান চরিত্র, ভোগী চরিত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাল্টাও।

তারপর

আর তোমরা যদি মনে মনে ভেবে থাকো, তোমরা অসম্ভব শক্তিধর, কেবল পশ্চিম বাংলায় নয়, সারা ভারতে তোমরা একটা বিশাল বর্ধমান 'ইয়ুথ পাওয়ার'—শুধু তাই নয় সারা পৃথিবীতে যুবশক্তি আজ উদ্ধত ঔদ্ধত্যে বিস্ফোরণমুখর হয়ে উঠেছে, তবে জেনো তোমাদের পৃথিবীব্যাপী ভাইবেরাদর সহ যদুবংশের মত ধ্বংস হয়ে যাবার দুর্বুদ্ধি মাথায় ঢুকেছে। তোমাদের বাপ-দাদাদের হাতে যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আছে তাও যদি তোমরা পাও—তাতেও তোমাদের নিস্তার নেই। তোমরাই সেই মহামরণের Cannon fodder ও মহতী বিনষ্টির কারণ হবে। তাতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তোমাদের চুল-দাড়ি আর নৃত্য-গীত কোনটার কিছু রক্ষা করবে না ইতিহাস। পৃথিবী ভারমুক্ত হবে মাত্র—পাপের বোঝা কমবে মাত্র। তারপর?

পরশুরামের ভাষায়ঃ

মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন, তারপর আবার সসত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করেন।

গামানুষ জাতির কথা—গল্প কল্প।

অর্থাৎ তোমাদের সহ আমাদের সকলকে কোন বিশেষ সভ্যতার গর্ভস্রাব হিসাবে বসুন্ধরা লজ্জায় আমাদের কোথাও পুতে দেবেন।

দায়ী কারা?

যুবশক্তির বর্তমান বিকৃত রূপটারই এতক্ষণ নির্মম সমালোচনা করেছি। কিন্তু মানুষের—বিশেষ করে যুবকদের এটাই একমাত্র পরিচয় নয়। দেশের জন্য, দশের জন্য, সত্যের জন্য, জীবন বরবাদ করে দেবার সাহস তরুণ বা যুবকদের মধ্যেই বেশী আছে। এই বয়সেই মানুষ সন্ন্যাসী হয়, সত্যের জন্য সবকিছু ছেড়ে দিতে পারে। যত বয়স বাড়ে তত ভোগের লিপ্সা বাড়তে দেখা যায়, এমনকি বার্ধক্যেও আজ আর কেউ বাণপ্রস্থ নেবার কথা ভাবেন না। লোভ, মোহ, ভোগলিপ্সাটা যেন নির্লজ্জের মত বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু তরুণের ধর্ম কি? তরুণেরা বেপরোয়া। হিসেব করে তারা চলে না। এদেরই মধ্যে থেকে যুগে যুগে শহীদেরা এসেছেন। এরাই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়। মহামানবদের ডাক চিরকাল প্রথমে এদেরই কাছে এসেছে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো—লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী সে ডাকে সাড়া দিতে কসুর করেনি। কিন্তু আজকের যারা নেতা, তারা তরুণদের কী লোভ দেখিয়ে ডাক দেন? আমাকে ভোট দাও, তোমাদের ভাল ভাল চাকুরি দিয়ে দেবো। বাড়ী গাড়ী সাড়ী করার অবাধ সুযোগ করে দেবো। যে নেতা যা চান তরুণদের কাছে, তিনি তা-ই পেয়ে থাকেন। ভোগের আদর্শ বা লোভ দেখিয়ে বর্তমান যুবশক্তিকে আমরা নষ্ট করে দিয়েছি। সেকথা আগেই বলেছি। এরজন্য দায়ী আমরা নেতারা, মোটাবেতনধারী অধ্যাপকরা, ভাড়াটিয়া দার্শনিকেরা. ব্যবসাদার সাহিত্যিকরা, চাটুকার সাংবাদিকেরা।

আর কি রাজনৈতিক জ্ঞানই না আমরা দিচ্ছি—বক্তৃতামঞ্চ থেকে, বিধানসভা, লোকসভার মঞ্চ থেকে, আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে! অশ্রাব্য গলাবাজী ও নির্বোধ দাবিদাওয়ার চীৎকার শোনবার মত ধৈর্য্য রক্ষা করাও শক্ত। বলা হয়, এটা গণতন্ত্রের যুগ। সামন্ততান্ত্রিক জাতিপাতি-ভেদ শ্রেণীভেদের নানা বাঁধন ভেঙ্গে চুরে দিয়ে দেশের দিগদিগন্ত থেকে

জনসাধারণ সমান অধিকারের দাবিতে ক্রমবর্ধমান পদধ্বনি করে চারিদিক থেকে রাজনৈতিক সমরাংগনে উপস্থিত হচ্ছে।

সব মানুষ সমান, সবার সমান অধিকার, গণতন্ত্রের অর্থ কেবল এইটুকুই নয়। এইটুকু যদি গণতন্ত্র হয়, তবে গণতন্ত্র মানুষের মধ্যে কোন স্থায়ী ঐক্যবোধ আনতে পারে না। প্রাকৃতিক গুণাগুণ ও শক্তিতেও সব মানুষ সমান নয়, যেমন একই হাতের সব আঙ্গুলগুলি সমান নয় এবং একার্থকও নয়। আঘাত লাগলে সব আঙ্গুলেই আমরা সমান ব্যথা পাই—এই অর্থেই সব আঙ্গুল সমান এবং হাতের কাজের জন্য যার যথা কাজ সেভাবে প্রতিটি আঙ্গুল সমান মর্যাদা পায়। সব মানুষ সমান ও সকলের সমান অধিকার—একথা বলেই যদি ছেড়ে দিই, তবে মানুষ আলাদা আলাদা, ছিন্ন-ভিন্ন, ব্যক্তিগত স্বার্থসর্বস্ব, আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়ে। একজনের জন্য অপরের কোন দরদ থাকার কোন প্রয়োজনই থাকে না। তাহলে ভালবাসা, দেশপ্রেম, শহীদের আত্মত্যাগের কোন অর্থই থাকে না। যেহেতু আজকাল সমান অধিকারের কথাটাই সর্বস্ব করে তুলেছি, সেহেতু যারা অতীতে দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন তাঁদের প্রতি একটা মৌখিক লোক-দেখানো শ্রদ্ধার ভাণ দেখাই মাত্র—প্রকৃতপক্ষে তাদের আমরা বোকা মনে করি।

সব মানুষ সমান, সবার সমান অধিকার—গণতন্ত্রের এই কথাটির কোন অর্থই হয় না—যদি না সঙ্গে সঙ্গে বলি সব মানুষ এক, সবাইকে নিয়ে একটা জাতি, এমনকি পৃথিবীর সব মানুষকে নিয়ে একটিই সভ্যতা, মনুষ্য সভ্যতা। সব আঙ্গুল সমান, কেবল এই অর্থেই যে একটি হাতেরই সব আঙ্গুলগুলি ; হাতের মধ্য দিয়েই আমরা আঙ্গুলগুলির সমান মর্যাদা ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকি। সব মানুষ যদি এক না হবে, তবে সবাইকে সমান অধিকার দিতেই বা যাবো কেন ? অন্যের জন্য সমবেদনা বোধ আসবেই বা কেন ? দেশের জন্য জোয়ানেরা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতেই বা যাবে কেন ? এই একাত্মবোধ বা ঐক্যবোধটা আজ যত দূর হয়ে যাচ্ছে, যত মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা, দলাদলি, কাড়াকাড়ি ইত্যাদি রাজনীতির অঙ্গ করে তুলেছি, তত সমান অধিকারের কথাটাও অর্থহীন

হয়ে পড়ছে, গুণ্ডাবাজী দুর্নীতি বেড়ে চলেছে—কে কার চেয়ে "বেশী সমান" তার প্রতিযোগিতা চলেছে।

কাকে জীবনের সার্থকতা বলে, এ সম্বন্ধেও আজ কোন স্ট্যাণ্ডার্ডের ঠিক নেই। যারা ধনবান তারাও জানে না তারা সারাদিন কী করবে, কী করার আছে? তারই জন্য মদ গাঁজা নেশার ধূম পড়ে গেছে। সময়টা নিয়ে কী করা হবে—যদি কোন সময় পাওয়া যায়—এ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেনসন নেবার পরে বুড়োরা কি করবেন ভেবে পান না। নাম কেনাটাই যদি জীবনের সার্থকতার মানদণ্ড হয়, আজ যাদের নাম প্রতিদিন খবরের কাগজে ওঠে, কাল যদি তিনি মারা যান, একদিনের—বড় জোর দুদিনের জন্য বড় বড় হেডলাইনে খবরটা বেরুবে। তার পরের দিন সেই কাগজে জুতো মুড়ে আমরা হয়তো সদ্ব্যবহার করবো—এবং দিব্যি ভুলে যাবো। বৎসরান্তে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার কথাটাও বেশীরভাগ লোকের মনে থাকবে না। আবার মৃতদের নাম ভাঙ্গিয়ে যারা নাম করতে চান, তারা কেউ কেউ জন্মদিবস পালনের জন্য উদ্যোগ করবেন—যাতে কোন সত্যিকার প্রাণ থাকবে না। বাড়ী গাড়ী শাড়ী হাঁকিয়ে রাজধানীগুলির বুকের উপর দিয়ে যারা বাহাদুরী দেখিয়ে বেড়ালে জীবনের সার্থকতা আছে মনে করেন, তারাও বোধহয় জানেন যে তারা জনসাধারণের কাছে ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু পান না। ব্যক্তিগত জীবনে ভোগ বা ক্ষমতার বাহাদুরী সত্যিই কোন স্থায়িত্ব দাবি করতে পারে না ইতিহাসে। মানুষকে ভালবাসতে পারা এবং প্রতিদানে ভালবাসা পাওয়া—এর থেকে আর কোন সার্থকতার বড় মানদণ্ড নেই।

ব্যক্তি মানুষের মহিমার প্রেরণায় বা তাড়নায় মানব ইতিহাসের চিরন্তন ধারা প্রবাহিত নয়। মানুষের ইতিহাস কয়েকজন মহামানবের ইতিহাসই নয়। মহামানব না হতে পারলেই জীবন ব্যর্থ হলো, একথা ঠিক নয়। নামহারা গোত্রহারা সাধারণ মানুষের নিরন্তর জীবনধারাই প্রকৃত ইতিহাস। মহামানবেরা মানুষের সেই অনন্ত যাত্রা-পথকেই স্বীকার করে মহামানব হয়েছেন।

ইতিহাস কাদের নিয়ে ?

ব্যক্তিগত জীবনে কোন না কোনো ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় লোক হয়তো সাময়িকভাবে অনেক মর্যাদা পায়। কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত সর্বসাধারণ মানুষ নিয়ে যে সামগ্রিক জীবনধারা সেটাই চিরন্তন বিচার্য সত্য।

মহান পথিকৃৎ বা শহীদ যারা হতে পারে নি, নিশ্চয়ই বেশীরভাগ সাধারণ লোক তা পারে না, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের স্থান, তাৎপর্য কিছু নয় একথা ঠিক নয়। বাকী সবাই নামহীন গোত্রহীন অপরিচয়ের অন্ধকারে যে জীবন ও মরণ বরণ করে নিয়েছে বা নিয়ে থাকে—তারা এই অনন্ত জীবনতরঙ্গে নিজেদের সার্থকতা কী দিয়ে বিচার করবে ? মানুষের ইতিহাস কেবল 'গ্রেটম্যান'-দের ইতিহাস বলে যারা বলেছেন, অথবা জীব জগতের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে মানুষ ব্যর্থ হয়েছে বলে নীটশেরা যেমন সুপারম্যানের আশায় বসেছিলেন, বা অরবিন্দ যেমন অতিমানসের সাধনা করেছিলেন, বা সাধারণভাবে সাধারণ লোক যেমন কোন মহা-মানবের বা অবতারের অপেক্ষা করে থাকে—রবীন্দ্রনাথও হয়তো প্রথম জীবনে এই ধরণের নির্দিষ্ট কোন মহামানবের সন্ধান করতেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁর এই ভুল ধারণা কেটে যায়। সমস্ত মানুষকে নিয়েই মানবের সামগ্রিক যাত্রাপথ, সেখানে কেউ তুচ্ছ নয় নগণ্য নয়। কোন একটি বিশেষ তীর্থেই মানুষের যাত্রাপথ শেষ হচ্ছে না—মানুষ ও জীবন চিরন্তন তীর্থযাত্রী—বা গোটাটাই একটা চলমান তীর্থ। তুচ্ছাতিতুচ্ছের মধ্যেও, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই মহান এককে দেখবার দৃষ্টি তাঁর এসে যায় এবং সে দৃষ্টি আসে ভালবাসার মধ্য দিয়েই—ভালমন্দ, জীবনমৃত্যু, ছোট বড়, সব কিছুকে এক সামগ্রিক সত্তার মধ্যে দেখবার দৃষ্টি থেকেই।

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগিয়ে মহামানব আসে—এমন ধরণের প্রত্যাশা খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। এই মহামানব-এর আগমন শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কোন একটি বিশেষ মানুষ, বিশেষ মহাশিশুর আবির্ভাব বলে মানেন নি—যেমন শিশুতীর্থের শিশুটি কোন বিশেষ শিশু নয়—সব শিশুই শিশুতীর্থের শিশু—সব মানুষকে নিয়েই সেই মহামানবের

যাত্রা। মহামানব একদিন আসবে—তাঁর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে তা নয়, সে সর্বদাই আসছেঃ

সে যে আসে আসে আসে
শুনিস নি কি তার পদধ্বনি·

* * *

অথবা, নিত্যকাল সে শুধু আসিছে ·

তার মানে এই, খণ্ড করে আলাদা করে দেখা নয়, সবাইকে নিয়ে দেখা। অতীত থেকে দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, যারা এসেছিল, যারা আজ আছে, যারা আসবে তাদের সবাইকে নিয়ে যে দেখা—সেটাই হলো বিশ্বদর্শন। মানুষের ভালবাসা পাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত মানুষের চরম পাওনা—জীবনের সার্থকতার মানদণ্ড। ভালবাসাটাই শেষ পর্যন্ত উপায় ও লক্ষ্য।

কিন্তু আজকের মধ্যবিত্ত ব্যক্তিসর্বস্ব আত্মসর্বস্ব যে সভ্যতার জন্য আমরা এত লালায়িত, তাতে এই সামগ্রিক দৃষ্টি নেই। ফলে এতে কেবল বিষই উঠছে। সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ করা, তাকে চোখে দেখতে না পাওয়া, তাদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে গিয়ে এক নিজস্ব স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করার স্বপ্ন এই মধ্যবিত্তকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু তার সর্বনাশ এখন ঘনিয়ে এসেছে।

এদের দেওয়া মূল্যবোধ ভাঙ্গতে হবে

যদিও জানি খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অঢেল যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী করার শক্তি ও জ্ঞান আমাদের কাছে আছে, যদিও জানি মাঠে মাঠে—সব মাঠে একাধিকবার বা বারো মাস চাষ করা চলে, ফসল চতুর্গুণ বাড়ানো চলে, দুধ, মাছ, সব কিছুই এই সুজলা সুফলা দেশে প্রচুর হওয়া সম্ভব, তবু এই মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে তা করার উপায় নেই যেন। যত রকমের বাস্তব পরিকল্পনাই উপস্থিত করি না কেন, মধ্যবিত্তরা তা কখনই কার্যকর করতে উঠেপড়ে লাগতে চায় না। উৎপাদনবিমুখ, ভোগসর্বস্ব, বাক্যজীবী এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সমাজ এ বিষয়ে মোটেই সিরিয়াস নয়। বাংলার মনোজগতে এই কর্মবিমুখতা

সভ্যতার ইস্পাতঘেরা আত্মকেন্দ্রিক দুর্গের মধ্যে মাথাগুঁজে পড়ে আছে। একে প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া দরকার। এদের কাছে চাষ বাস কাজ কর্ম কোন কিছুর প্রোগ্রাম নিয়ে কোন কিছু আশা করা ভুল। একটা কোন সাংঘাতিক আঘাত ছাড়া এদের এই নেশাঘোর অবস্থা থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এই মধ্যবিত্ত সভ্যতা সামান্য নয়, এরাই ব্যুরোক্রেট, টেক্‌নোক্রেট্, শিক্ষক, অধ্যাপক, ব্যাঙ্কার, বক্তা, দলপতি, জার্নালিষ্ট, নাট্যকার, চাটুকার, গুণ্ডার সর্দার, কালোবাজারের পাণ্ডা ইত্যাদি, এরা সবাই মিলে একটা ব্যূহ রচনা করে রেখেছেন। নিজেদের মধ্যে এদের যত বিরোধই দেখা দিক না কেন, আসলে এরা একটাই ক্লাস। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে প্রথমেই এদের দেওয়া মূল্যবোধ ভালমন্দ জ্ঞানকে অস্বীকার করতে হবে।

রাক্ষস ও মানুষ

সেদিন আমাদের একজন শুভানুধ্যায়ী জ্ঞানবৃদ্ধ ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "দেখছি আপনারা দেশের কাজ করার জন্য, পরিকল্পিত উপায়ে দেশগঠনের জন্য নানা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু মানুষ বানাবার জন্য পরিকল্পনা করছেন তো, না রাক্ষস তৈরীর পরিকল্পনা করছেন ?"

তক্ষুণি, প্রশ্নটা আমাদের দেশে এখন অবান্তর বলে উড়িয়ে দিতে পারতাম, কেননা মানুষের রাক্ষুসে ক্ষিধে মেটাবার দায় আমাদের এখনও আসেনি, যেমন আমেরিকান ইয়োরোপীয়ানদের রাক্ষুসে ক্ষিধেটা মেটানর চেষ্টাই ওদের একমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেরণা। মাটির নীচে ও উপরে যেখানে যা কিছু সম্পদ আছে তা কয়েক দশকের মধ্যেই কয়েকটি জেনারেশন যদি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যায় তাতেও তাদের কোন ভাবনা নেই—পৃথিবীর যেখানে যত কয়লা, তেল, সোনা, রূপা, লোহা প্রভৃতি সম্পদ আছে তা তাদের রাক্ষুসে ক্ষিধে মেটাবার জন্য শেষ করে দিতে পারলে যেন তারা শান্তি পাবে। মাটির উপর যা কিছু শস্য, ফল ফুল ফসল হয়, গরু ছাগল শূয়ার হাঁস মুরগী মাছ যা কিছু তোলা যায়, তাতে রাক্ষুসে ক্ষিদে মেটানো শক্ত হয়ে পড়েছে—এখুনি—এরপরে সমুদ্র মন্থন করতে হবে, তার জন্য তোড়জোড় সুরু হয়েছে।

কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র দেশে সমস্যাটা তা তো নয়, মোটা ভাত কাপড় সকলের জন্য ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব—যেটুকু না হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুতে পরিণত হয়ে যায়, পশুর মতন সদা ভীত, সন্ত্রস্ত, বিপন্ন, অসহায় হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্যা রাক্ষস হওয়া নয়, পশুস্তরে নেবে গিয়ে বহুজাতীয় পশুকূলের মতই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যাওয়ার তাড়না।

কিন্তু আমরা বোধহয় অস্বীকার করতে পারি না যে সাধারণ মানুষের মোটা ভাত কাপড় যোগান দেবার উদ্যোগ বা পরিকল্পনার মধ্যে এই দেশেও কতিপয় লোকের বা উঠতি রাক্ষসদের ক্ষিধে মেটাবার তাড়না আমাদের পথভ্রষ্ট করে চলেছে। গুণগত উৎকর্ষ বা জীবনধারণের উন্নতমানের নামে এদেশে ক্ষুধার্ত নরনারীর বুকেও রাক্ষুসে ক্ষিধে জাগাবার প্ররোচনা, লোভ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেই চলেছে। ইয়োরোপ আমেরিকার ভোগলোলুপ স্নায়ুচেতন (Sensate) ষড়রিপুবর্ধক বিষম-বিষয় কাতর সভ্যতার উগ্র আবেগ এদেশেও বিরাট আকারে আমদানী করার জন্য দুর্দান্ত আকুতি বর্তমান ; রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তানায়ক, ধনপতি, দলপতি, নেতা ও কর্মীদের মধ্যে। একথা মনেই থাকে না যে আমাদের ও সারা পৃথিবীর হাতে যে সম্পদ ও সঙ্গতি আছে তা দিয়ে আগামী একশ বছরের মধ্যেও বোধহয় লোকবহুল দরিদ্র এশিয়াকে ইয়োরোপ বা আমেরিকা করে ফেলতে পারি না। সম্পদের সীমা বা Limit of resources বলেও একটা প্রাকৃতিক বন্ধন আছে। তাছাড়া ইয়োরোপ আমেরিকাতেই কি সকলের জন্য তথাকথিত উচ্চ-জীবনমান ও ভোগবিলাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে ? সেখানেও কী অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী নয়—সুখী সমৃদ্ধদের তুলনায় ? সংখ্যালঘু-সমৃদ্ধদের উচ্ছল জীবন সৃষ্টি করতেই কি ইতিমধ্যে তাদের নিজস্ব সম্পদে টান পড়েনি এবং রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ অবসান হলেও সারা পৃথিবীর সম্পদ লুটে নেবার নয়া উপনৈবেশিক কৌশল চালু করেনি, যার ফলে অনুন্নত সদ্যস্বাধীন অথচ তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে উন্নত দেশগুলির জীবনমানের পার্থক্য হু হু করে বেড়েই চলেছে ?

আমাদের দেশেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বহুল প্রয়োগ ও প্রযোজনার দরকার আছে, বরং এতবড় দেশের ততোধিক বৃহৎ দারিদ্র্যকে মোকাবিলা করার জন্য কেবল আমাদের দুর্বল বাহুশক্তিই যথেষ্ট নয়, এই দারিদ্র্যের বোঝা উপড়ে ফেলে দিতে হয়তো ইয়োরোপ আমেরিকার চেয়েও আমাদের বিজ্ঞান শক্তি ও বুদ্ধি—প্রযুক্তিবিদ্যা বর্তমান আমেরিকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানী বা অনুকরণ হতে পারে না—Transport of American Technologyতে চলবে না, চলা সম্ভব

নয়। ওদের দেশের বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রয়োজন এসেছে যে ধরণের শোষণবাদ, ক্ষমতালিপ্সুতা ও ষড়রিপু কামনার তাড়নায়—মুষ্টিমেয়র স্বার্থে, হুবহু তারই অনুকরণ যদি আমরাও করতে চাই, আমাদের টেক্নলজিতে বিজ্ঞানে সমতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে ৫৫ কোটি লোকের জন্য, তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের রূপ ও লক্ষ্য ইয়োরোপ আমেরিকার মতই হতে হবে, বিজ্ঞানের গবেষণাক্ষেত্রে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, বিজ্ঞান এমনই—অন্য কোনরূপ হতে পারে না, বিজ্ঞানের সাধনায় পারমাণবিক বোমাই লক্ষ্য, মনুষ্যকুল নিধনের জন্য এমন কোন নিয়মই নেই। বিজ্ঞানের সাধনা দরিদ্র জনসাধারণের জীবন রক্ষার জন্য—ভিন্ন উদ্দেশ্যেও পরিচালিত হতে পারে। এদেশের কৃতী ও প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের আজ ইয়োরোপ আমেরিকাতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু অতীতে এ প্রয়োজন থাকলেও আজ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা ও টেকনলজীর সাধনা করতে হবে—সেই সাধারণ সত্যটাকেই চোখ বুঁজে অস্বীকার করা হচ্ছে। *এদেশের প্রয়োজনে যে বিজ্ঞান ও টেকনলজীর প্রয়োজন তা এদেশেই সৃষ্টি করতে হবে, সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ ও লক্ষ্য সামনে রেখে।*

যদি তা না করি, যদি গড্ডলিকা স্রোতে ভেসে যা চলেছে তাই চলতে দিই, এবং এমন বিজাতীয় বিজ্ঞান ও সমাজচেতনা নিয়ে দেশ গঠনের পরিকল্পনা রচনা করি তবে দেশে মানুষ গড়ার প্রকল্প দাঁড়াবে না, পড়বে রাক্ষস গড়ার ধুম, শিব গড়তে বানর। ৫৫ কোটি নরনারীর ৩০ কোটিই যেখানে দারিদ্রসীমার নীচে পড়ে আছে, দু'বেলা মোটা ভাত ডালও যাদের জোটে না, সমগ্রভাবেই এখানকার সবলোকই যখন জীবন-সংগ্রামে অস্থির, তাদেরকে যদি লোভ দেখানো হয় আমেরিকার উচ্চ-মানের জীবনের সোনালি স্বপ্ন দিয়ে, তবে ব্যাপারটা দাঁড়াবে কী? এই সীমিতসম্পদ ও অতি মন্থর উন্নয়নের স্বল্পতা পদে পদে ঘরে ঘরে সৃষ্টি করবে একটা অসহনশীল তিক্ততা, প্রতিযোগিতা ও কাড়াকাড়ি—যার নির্ঘাত ফলশ্রুতি হলো সমাজ ও গৃহ-জীবনে অনির্বাণ ঈর্ধা ও হিংসা সমাজতন্ত্র হলো আমাদের লক্ষ্য, সমানাধিকার আমাদের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট, গণতন্ত্র হলো আমাদের পথ—ইত্যাদি যত বড় বড় আদর্শই আমরা

দেশের জন্য নির্ধারিত করি না কেন, বেহিসাবী সংযমহীন নির্লজ্জ লোভ, প্রতিযোগিতা ও অবাধ বিষয় বাসনা, উন্নতমান আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনের ভোগাকাঙ্ক্ষা—এসব উলঙ্গ প্রেরণাগুলি আমাদের সমাজতন্ত্র ও সমানাধিকারের যাবতীয় আবরণকে মুহূর্তে ছিন্ন-ভিন্ন তছনছ করে দেবে। দিচ্ছেও না কী ? যতই আয় বৈষম্য, স্থানীয় বৈষম্য, অসাম্য দূর করার কথা বলি না কেন, রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে, পত্র-পত্রিকা থেকে যতই সমাজতন্ত্র সমানাধিকার ও গণতন্ত্রের দোহাই দিই না কেন, যত রকমের কড়া কঠিন আইনই পাস করি না কেন, সবই "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো" হয়ে ফাঁকা কথা হয়ে যাচ্ছে, বৈষম্য অসাম্য হিংসা এসব বাড়ছে বই কমছে না। এটা একটা অতি সাধারণ অঙ্ক দিয়েও বোঝা উচিত যে যদি আগামী ১০ বছরের মধ্যে তথাকথিত উচ্চমানের একটা মিনিমাম মান অনুযায়ী ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত করার প্রকল্প নেওয়া হয় তাহলে যে *ধনসম্পদ বা ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করা যাবে তাতে ৬০ কোটি জনসমষ্টির* সকলের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়, বড়জোর ২০ কোটি লোক সে সমৃদ্ধি *পেতে পারে। অথচ ঐ সৌভাগ্যবান ২০ কোটিকে বাকী ৪০ কোটির* বিরুদ্ধে একটা গোপন অথচ অনির্বাণ জেহাদ চালাতে হবে—৪০ কোটিকে বঞ্চিত করতে না পারলে বাকী ২০ কোটি উচ্চমানের জীবনস্তর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। বস্তুত এ জাতীয় অন্তর্যুদ্ধ (শ্রেণীতে শ্রেণীতেই নয়, প্রতি শ্রেণীর মধ্যেই এই অনির্বাণ অন্তর্যুদ্ধ লেগেই আছে) তখন অবশ্যম্ভাবী—যার ফলশ্রুতি হলো—সমাজে হিংসা, গোপন ও উন্মুক্ত হিংসা, ধর্মে ধর্মে, ভাষায় ভাষায়, পাড়ায় পাড়ায়—আর চোরা কারবার, কালোবাজার, ঘুষ, দুর্নীতি ও নোংরা হিংসার বিষাক্ত আবহাওয়া।

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে মানুষের জন্য পরিকল্পনা করছি বটে, কিন্তু লোভ ও ভোগাকাঙ্ক্ষার উপরে কোন প্রকার সংযম বা মাত্রা নির্দিষ্ট না করার ফলে সমাজে রাক্ষসেরা অবাধ সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে, সব তছ্-নছ্ করে চলেছে, সব শুভপ্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিচ্ছে। এই জাতীয় সংযমহীন সমাজে কে দুর্বল কে সবল তার উপরে বিশেষ কিছু আসে যায় না, কেননা দুর্বল সবল সকলেরই প্রাণে রাক্ষুসে ক্ষিধে ও চেতনা সৃষ্টি করে দেওয়া হচ্ছে। দোষী নির্দোষী বেছে বের করার মত কিছু নেই।

অতএব, সমাজতন্ত্র চাই, অসাম্য দূর করতে চাই—এই কথাগুলির বিশেষ কোন মূল্যই থাকবে না, যদি সঙ্গে সঙ্গে ভোগমাত্রা ঠিক করা না হয়। মোটা ভাত মোটা কাপড় সকলের জন্য যখন একইভাবে দেওয়া সম্ভব হবে তখন উচ্চতর মানের প্রযোজনীয় দ্বিতীয় মাত্রার কথা ভাবা যেতে পারে, তার পূর্বে নয়। ৫০-৬০ কোটি দরিদ্র লোকের মোটামুটি যা প্রয়োজন, উৎপাদনে তারই অগ্রাধিকার দিতে হবে—বিলাসবস্তু উৎপাদনে নয়। কোয়ান্টিটিই আমাদের বর্তমান লক্ষ্য উৎপাদন প্রকল্পে —কোয়ালিটি বা উচ্চ মান জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুর বাহার নয। মায়ের দেওয়া মোটা ভাত কাপড় বা স্বদেশীর কথা আবার স্মরণ করতে হবে। জীবন সম্ভোগ করার স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটলে চলবে না।

এটা গান্ধীবাদী ঢং-এর কথা বলে হাসলে চলবে না, বা অহিংসা প্রেম ইত্যাদি অবতারণা করা হচ্ছে বলে ঠাট্টা করলেও চলবে না। একথা অবশ্য ঠিক যদি মানুষ মানুষকে ভালবাসে, প্রতিবেশীকে ভালবাসে, হিংসা বা অসূয়াতে জ্বলে পুড়ে না মরে, তবে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় শাসন বা সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ইত্যাদি আইনের রাজত্বের প্রয়োজন হয না। কিন্তু ভালবাসাটা নির্ভরযোগ্য উপাদান নয়, মানুষ তার ভালবাসা অতি ক্ষুদ্র-তম গণ্ডীর মধ্যে (নিজ পরিবারের মধ্যে এমন কি নিজের মধ্যেই) সীমাবদ্ধ করে রাখে। অতএব ভালবাসা বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য হাতিযার বা বন্ধন নয়, যদিও প্রত্যেকের বুকেই কিছু না কিছু ভালবাসা আছে এবং সে ভালবাসা ও স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন প্রত্যেকের জীবনই পারি-বারিক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হলেও মানবিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে কোন লঘুবস্তু নয়। বৃহত্তর জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ভালবাসার কি তাই বলে কোন স্থানই নেই ?

দেশপ্রেম তবে কী, যদি দেশের মানুষের প্রতি তার কোন প্রয়োগ না থাকে ? অন্যদেশকে ঘৃণা করার নামই কী দেশপ্রেম ? প্রেম বা ভালবাসা যদি সমাজ শাসন ও নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নির্ভরশীল কোন হাতিয়ার নাই হয়, তার অর্থ এই নয় প্রেম ও প্রীতির কোন দরকার নেই, কেবল ব্যক্তিগত অধিকার, মৌলিক অধিকার, আইন কানুন শক্ত করে গড়লেই চলবে ? সমাজ থেকে, পারিবারিক জীবন থেকে দেশ থেকে প্রেমকে

বিদায় দিয়ে অহিংসাকে দূর করে দিয়ে আমরা কেবল আইন চিবিয়ে বাঁচতে পারবো? এবং প্রেম ও সহজাত শালীনতাবোধ যদি বিদায় করে দিই জীবন থেকে, তবে আইনকে ফাঁকি দেবার পক্ষে আর কোন চক্ষু-লজ্জাও থাকবে না। হ্যাঁ সমাজতন্ত্র চাই, সমানাধিকার চাই,, গণতন্ত্র চাই, অসাম্য দূর করতে চাই—সেইমত আইন কানুন সবই চাই—তাই বলে জীবনে প্রেম চাই না এ একথা বলা হাস্যকর। বরং বলা চলে, সমাজ-তন্ত্র গণতন্ত্র সাম্যতন্ত্র ইত্যাদি এই জন্যই চাই যাতে মানুষের ধর্ম, প্রেম ও অহিংসার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়, বিকাশ লাভ করে। মনুষ্যত্বের অনুকূল বাতাবরণ শুদ্ধ হয়, তবেই—মানুষ রাক্ষস দেশের বিষাক্ত ভয়ার্ত ও আগ্রাসী বাতাবরণ থেকে নির্ভয় হতে পারে।

জানি মানুষ অল্পে খুশি নয়, ভূমৈব সুখং। ইয়োরো-আমেরিকান উচ্চমানের ভোগবিলাসের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে মায়ের দেওয়া মোটা ভাত কাপড়ে ভারতীয়দের সন্তুষ্ট থাকার কথা যখন বলছি তখন তাদের স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকার উপদেশ দিচ্ছি না।

বস্তুত বস্তুবহুল ষড়রিপুবর্ধক সভ্যতা সত্যকার আনন্দ শ্রেয়ো বা ভূমার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না। আজ আমেরিকাতে হিপ্পিজাতীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, অথবা ভিয়েতনামের উপরে নির্লজ্জ বর্বর নিষ্ঠুরতায় সে আপন রাক্ষুসে চরিত্রের বিকটতম প্রকাশ দেখাচ্ছে। মানুষের আদর্শে ভূমার সংজ্ঞা রাক্ষসকল্পিত ভূমার সংজ্ঞার মত নয়। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির—উন্নত উদার সেই ভূমার ঐশ্বর্য্য মনের ঐশ্বর্য্য মোটামুটিভাবে সবাই খেয়ে পরে থাকতে পারে এমন একটি সভ্য ভারতেও সবাই উপভোগ করতে পারবে, হিপ্পি অথবা কৃতান্তক দানবের সাধনা না করলেও চলবে। তাছাড়া এজাতীয় মনুষ্যোচিত সংযম ও মাত্রাজ্ঞান ভিন্ন আমাদের সীমিত সঙ্গতি দিয়ে দেশ গঠন করাই সম্ভব হবে না, লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষা, ঘুষ, চুরি, দুর্নীতির সুড়ঙ্গ দিয়ে রাক্ষসদের রাজ-দরবারে সব সঙ্গতি পাচার হয়ে যাবে—জনসাধারণ পশুবৎ দরিদ্র জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতেই পারবে না। দেখা যাবে, এক পা এগুচ্ছি তো দুই পা পিছিয়ে যাচ্ছি।

গান্ধী জন্মজয়ন্তী দিনের চিন্তা

গান্ধীদর্শন বা জীবনদর্শনের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে আজকের আলোচনাটা সুরু করা যাক। অবশ্য গান্ধীজীর বিচারে সে অর্থনীতি শেষপর্যন্ত দাঁড়াতেই পারে না যা নীতি-বর্জিত বা নীতিহীন। অর্থনীতিতে আবার নীতি কেন, অর্থনৈতিক বিকাশের উপরে নীতির শাসন রাখতে গেলে অবাধ উন্নয়ন সম্ভব হবে কি, এজাতীয় প্রশ্ন তথাকথিত 'স্বাধীনতাবাদী' অর্থনীতিবিদেরা ও রাজনৈতিকেরা তুলেছেন। বাইবেলে উল্লেখিত unto the last-এর কাহিনী অনুসরণ করে টলষ্টয় ও রাস্কিন যে ধরণের অর্থনীতির কথা বলেছিলেন সেই ধারানুসারে গান্ধীজীর অর্থনীতি নীতিশাসিত। নীতিটা ধর্মের ব্যাপার, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ধর্ম কেন, এ ধরণের প্রশ্নও তথাকথিত প্রগতিবাদীরা তুলেছিলেন, যার জন্য গান্ধীজীকে মূলত একজন রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতা বলে নিন্দা করার চেষ্টা করেন। কৃচ্ছ্রসাধনা ও ধর্মসাধনার অভিযোগে গান্ধীজীকে অভিযুক্ত করেন, এবং গান্ধী দেশটাকে পিছিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন বলে গালমন্দ করেন।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও নীতি-শাসিত। ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রেরণাতে যে ধরণের মূল্যবোধ আছে, সমাজতন্ত্রে তার বিপরীত। অতএব অর্থনীতি সত্যিসত্যি নীতি বা মূল্যবোধবর্জিত ব্যাপার নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতিবিদেরাও গান্ধীজীর নীতিবাদের উপর এতটা জোর দেওয়াকে পছন্দ করেন না, এবং তারাও গান্ধীজীকে তাঁর নীতিবাদের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেন। এর কারণটা কী? সমাজতন্ত্রবাদীরা (কমিউনিস্ট সহ) সমাজতন্ত্রের প্রযোজনে ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যে ধরণের প্রচারণা করেন, তাতে মৌলিক জীবনাদর্শের দিক থেকে কোন নতুন মূল্যবোধের কথা বলেন না। তাদের

নৈতিক আক্রমণটা হলো ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই জন্য যে ধনতন্ত্রে সুখসুবিধাগুলি মুষ্টিমেয় ধনী বা পরশ্রমজীবীরাই ভোগ করতে পারে। সমাজতন্ত্রের বক্তব্য হলো, এই সুখসুবিধাগুলি সার্বজনীন করতে হবে। কী ধরণের সুখসুবিধা তা নিয়ে তাদের প্রশ্নটা বড় নয়, সুখসুবিধার যে মূল্যমান বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড আজ পৃথিবীতে কোথাও কোথাও কারো কারো ভাগ্যে জুটেছে, সেটা সকলের জন্য করে দিতে হবে। জীবনকে উপভোগ করাই জীবনের লক্ষ্য, অতএব ভোগবাদকে স্বীকার করে নিয়ে তা সার্বজনীন করে দিতে হবে। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ধনতন্ত্রে সীমিত, কেননা তা মুষ্টিমেয় লোকের লাভলোকসানের মাপকাঠিতে বাঁধা ; এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাধাকে বিচূর্ণ করে দিয়ে সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারলেই, সার্বজনীন ভোগের প্রয়োজনে অবাধ উৎপাদন করা, পর্যাপ্ত উৎপাদন করার ক্ষমতা মুক্ত হবে। ফলে আজ অতি উচ্চবর্ণের লোকেরা বা উচ্চমধ্যবিত্তেরা যা ভোগ করতে পারছেন, তা তখন সকলেই ভোগ করতে পারবেন। অতএব এক ধরণের নয়ামূল্যবোধের যুক্তি দিয়ে সুরু হলেও, সমাজতান্ত্রিকেরা শেষ পর্যন্ত যা নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন (যেখানে যেখানে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন) সে হলো কর্মোদ্যম ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ। নীতিটা সেখানে খুব বড় প্রেরণা বা শাসন হলো না, বড় প্রেরণাটা এলো উৎপাদনে। এবং এই উৎপাদনের প্রেরণা বা incentive হিসেবে অনেক রকমের ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদী লাভালাভের ইন্ধনকেও মেনে নিতে হলো।

ধনতান্ত্রিক সমাজকে ভেঙ্গে দিয়ে তার সীমিত সুখসুবিধার ক্ষেত্রকে যতদিন পর্যন্ত না বিস্তৃত করা যায়, ততদিন পর্যন্ত সম্ভোগের উপরে একটা শাসন বা নিয়ন্ত্রণ রাখতেই হবে সমাজতান্ত্রিকদের। অর্থাৎ যা তৈরী হবে বা হচ্ছে তা ভাগ করে নিতে হবে। এই সমান ভাগ করে নেবার ভিতর নিশ্চয়ই একটা নীতির কথা আছে, কিন্তু তাও আপেক্ষিক বা relative। অবাধ ভোগবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিকের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আগে অবাধ ভোগ্যবস্তু তৈরী করো, এবং যতটা করতে পারা যায় ততটা ভোগ করো, সবাই মিলে, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই ভোগবাদী সচ্ছলতা সৃষ্টি করতে পারো তার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যাও।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে গান্ধীজীর বিচার বাস্তবিকই "রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশাল"। গান্ধীজীর বিচারে অবাধ ভোগবাদ মানুষের জন্য প্রয়োজন নয়, এবং সর্বমানবের জন্য বাস্তবেও সম্ভব নয়। এখানে জীবনাদর্শ ও অর্থনীতি এই দুই দিক থেকেই গান্ধীজীর বিচার ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে ভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ মূলত ঈর্ষাজাত, অর্থাৎ ধনীরা যা ভোগ করেন তা সবাই ভোগ করতে পারবেন না কেন! ধনীদের ভোগাদর্শের বিরুদ্ধে যত নয়, তাদেরই সৃষ্ট ভোগবাদ সকলের জন্য প্রাপ্য নয় কেন, এর উপরেই জোরটা পড়ে।

গান্ধীজীর নীতি বা জীবনাদর্শের কথা না হয় পরেই তুলবো, স্রেফ অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর এই যে ধারণা যে অত উচ্চমানের ভোগবাদী বস্তু-বহুল সচ্ছলতা সারা পৃথিবীর জনসাধারণের পক্ষে প্রাপ্য করে তোলার মত সম্পদ সারা পৃথিবী দোহন করেও পাওয়া সম্ভব নয়, এ কথাটারই প্রথমে বিচার করা যাক। কেননা এখানে ভাববাদী তর্কবিতর্কের অবকাশ নেই, স্রেফ আঙ্কিক হিসেবনিকেশ বা economic reality দিয়েই বিচার করা যায়। পৃথিবীতে আজ শক্তি সংকট বা energy crisis ও পরিবেশ দূষিতকরণ বা pollution জনিত সংকটের কথা হঠাৎ এসে যেন যমের মত উপস্থিত হয়েছে। Limits of growth, বা অবাধ বিকাশের প্রতিকূলে এক দুরন্ত বাধা বা সীমা দেখা দিয়েছে। তেল, কয়লা, লোহা, তামা, সীসা, টিন ইত্যাদি পদার্থ অত্যন্ত সীমিত বলে দেখা যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে যে সংখ্যালঘু শ্রেণীরা তাদের ভোগবাদ কায়েম করতে পেরেছে, তাদের ভোগবাদ পূরণ করতেই এই সীমা উপস্থিত। বাকী তিন-চতুর্থাংশ বিপুল জনরাশির দারিদ্র মোচন করে উচ্চমধ্যবিত্তদের মত জীবনমান কায়েম করতে গেলে এই সমস্ত মৌলিক উপাদানগুলি অতি সত্বর শূন্য হয়ে যাবে, কেননা এই সব সম্পদ বারে বারে পৃথিবীর ভূগর্ভে আর জমা হয় না, একবার ফুরিয়ে গেলেই চিরকালের জন্য ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ইতি-মধ্যে উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল, সবদেশেই ভোগবাদের ব্যাপক তাড়া পড়ে গেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই উচ্চমানের ভোগবহুল সচ্ছলতার জন্য প্রাণপণ প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে। ফলে পৃথিবী ধীরে ধীরে

অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে বলাই বা কেন, খুব দ্রুতই বলা চলে। আমাদের উন্নতির বা উন্নয়নের জন্য কর্মকাণ্ডের বিচার হচ্ছে কী দিয়ে? কত তাড়াতাড়ি আমরা জলস্থল থেকে তেল, কয়লা, তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি তুলে ফেলতে পারছি তাই দিয়ে। এখানে দেরী সয় না, এমন তাড়া পড়ে গেছে। আজ থেকে একশ' বা পাঁচশ' বছর পরে এসব বস্তু পৃথিবীতে আর থাকবে কিনা, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, সেজাতীয় ভাবনা কোথাও নেই, যা আছে, তা সত্বর তোলো, উড়েপুড়ে ছারখার হয় হোক, আমাদের জীবনেই সম্ভোগের চূড়ান্ত করে নিতে চাই।

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রায় সবদেশই স্বাধীন হয়ে যায়, ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে 'মুক্ত' হয়ে সবাই উন্নয়নের রথচক্রে বসে উন্নত দেশগুলির অনুকরণে নিজেদের উন্নয়ন করতে লেগে যায়। দেখা যায় পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির সঙ্গে উন্নয়নকামী দেশগুলির গ্যাপ কেবল আপেক্ষিক বা রিলেটিভ গ্যাপের পার্থক্যই নয়, অ্যবসলিউট গ্যাপও বেড়ে গেছে। অর্থাৎ অনুন্নত অথচ উন্নয়নশীল অহমিকা-সম্পন্ন এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার বিপুল জনসাধারণের খাওয়া-পরা প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনমানের মানদণ্ড আরও সংকুচিত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ দারিদ্র সম্প্রসারিত হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে এই সব দেশের কোনই "উন্নতি" হয়নি, নিশ্চয়ই কলকারখানা, রাস্তাঘাট, স্কুলকলেজ ইত্যাদির অনেক উন্নতি হয়েছে, অঙ্ক দিয়ে তা সর্বদাই দেখানো হয়। কিন্তু এই উন্নতি বা উন্নয়ন সত্যিকার কোন স্বাবলম্বন বা স্বরাজ আনছে না, অতীতের প্রভুদেশগুলির উপর নির্ভরতা বা পরাধীনতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য আজ আমাদের জীবন এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তুলেছে যে এসব দেশের প্রাণকাঠিটাই যেন আজ বিদেশে—উন্নত দেশগুলির নিকটে। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না, এবং এসব বৈদেশিক সাহায্যে বৈদেশিক আদর্শে দেশে যতটুকু উন্নয়ন হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে বিদেশ-নির্ভর, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণও সাহায্যদাতা দেশগুলির সম্পদই বৃদ্ধি করে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সামান্যই তার

অবশিষ্ট থাকে। বিদেশী সাহায্যে ও প্রেরণায় এমন সব যন্ত্রপাতি ও স্টীল প্রভৃতি তৈরী হয়, যার বাজার দেশের ভিতরে বৃদ্ধি পায় না, তা বিদেশে চালান করে দিয়েই আবার নতুন করে ঋণ পাবার জন্য হাত পাততে হয়।

এ যেন এক বিচিত্র জটিল ধাঁধা, বা ভিসিয়াস সার্কেল। বিদেশী সাহায্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হবার তাগিদে আরও বেশী বিদেশ-নির্ভর হয়ে এক অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছি যেন। বিদেশী উন্নত দেশগুলিও এজাতীয় সাহায্য, বাণিজ্য ও ঋণ দানে শেষ পর্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না, কেননা এই সাহায্য ও বাণিজ্যের চক্র দিয়েই তারা সারা পৃথিবীকে ঘিরে ফেলেছে এবং অক্টোপাসের মত সারা পৃথিবীর সম্পদ বা resources সংগ্রহ করার এক চতুর জাল ফেদে সব শোষণ করে নিচ্ছে। কিন্তু উদীয়মান (!) উন্নয়নকামী দেশগুলির কর্তাব্যক্তিরা সেই ফাঁদে পা দিয়ে যাচ্ছেন কেন ? প্রথমত তাঁরা নিজেরাও এজাতীয় সভ্যতার কিঞ্চিদধিক উচ্ছিষ্ট ভোগ করে থাকেন, এসব দেশেও একশ্রেণীর নতুন মধ্যবিত্তের জন্ম হযেছে যারা এ ভোগবাদে বিশ্বাস করেন এবং কিছু না কিছু তা ভোগ করে থাকেন। এসব দেশেও উচ্চমানের গাড়ী, আকাশযান, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আবাস ও অন্যান্য উচ্চমানের জীবনের ভোগী দুরন্ত লোভী এক মুষ্টিমেয উপরতলার লোক জন্মেছে যারা শাসনক্ষমতায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কৃষ্টিক্ষেত্রে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা সবাই যে শঠ বা প্রতারক তা নয়। তারা যে জীবনাদর্শকে দেশের আদর্শ বলে ধরে নিয়েছে তারই ফলশ্রুতি এটা। দেশের কোটি কোটি লোকের দুরবস্থা তারা লক্ষ্য করে না তা নয়, কিন্তু যে পথে তারা দেশের উন্নয়নের জন্য অগ্রসর হয়েছে সেই পথের পুনর্বিচার যতদিন পর্যন্ত তারা না করবে ততদিন তাদের ভুল ভাঙবার নয়। পাশ্চাত্য উন্নত সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়েই তাদের এই ভুল। ভোগবাদের আদর্শ দিয়ে দারিদ্র দূর করা সম্ভব নয়, গান্ধীজীর এই দূরদর্শিতার কথা বিচার না করার ফলেই অন্ধগলিতে আজ তারা প্রবেশ করে বসেছে— যা থেকে ফিরে আসা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

এখানেই আবার অর্থনীতির সঙ্গে নীতির সম্পর্কের কথা ঘুরে আসে। দারিদ্র দূর করতে হবে, এ বিষয়ে গান্ধীজীর আগ্রহ কোন সমাজতন্ত্রীর

চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু দারিদ্র দূর করা, আর ভোগবাদ প্রতিষ্ঠা করা তো এক কথা নয়। দারিদ্র দূর করার জন্য, পরাধীন ভারতেও, সীমিত পরিস্থিতির মধ্যে দরিদ্রদের জন্য তিনি নানা ধরণের কাজ দিতে চেয়েছিলেন, এবং স্বাধীন ভারতে সেই কাজকর্মই অবারিতভাবে বৃদ্ধি পাবে, পরাধীনতার মধ্যে তা সম্ভব নয় বলেই তিনি স্বাধীনতা বা স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

দারিদ্র কাকে বলে? সহজ সরল অনাড়ম্বর কর্মময় সুন্দর জীবন আর দারিদ্র যেমন এক কথা নয়, তেমনি সে সুন্দর জীবন সার্থক জীবন ভোগবাদও নয়। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের দারিদ্র দূর করার অভিযানে যদি আমরা তাদের মাথায় শীতপ্রধান সমৃদ্ধ দেশের ভোগবাদী আদর্শ প্রচার করে তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিই, তাতে তাদের সর্বনাশই করা হবে। খালি গায়ে মাঠের কাজ করাটা দারিদ্রের লক্ষণ নয়, খালি পেটে শীর্ণ দেহে মাঠে কাজ করাটাই সত্যিকার দারিদ্র। নাইলনের শাড়ী বা জামা পানতালুন না পরানো পর্যন্ত দারিদ্র দূর হলো না, হুঁকার বদলে সিগারেট ও মদ না খাওয়াতে পারলে দারিদ্র দূর হলো না—এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিকারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজী ভাষায় কথা না বলতে পারলেই সে অশিক্ষিত এজাতীয় বিকৃত বুদ্ধি ও বিচার থেকে তিনি দেশকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিমি মনে করতেন মনুষ্যশক্তিই এদেশের আসল শক্তি, এই শ্রমশক্তিকে উপেক্ষা করে অন্যান্য শক্তির সন্ধানে আমরা আজ দেশকে উজাড় ও দেউলে করতে বসেছি। জামাকাপড়ের চাকচিক্য দিয়ে মনুষ্যত্বকে ঢেকে ফেলে দিয়েছি। নিজের বলিষ্ঠ মন ও দেহটাকে বিদেশ থেকে ধার করা মুল্যবোধ দিয়ে লজ্জিত করে ছেড়েছি, খালি পায়ে দাঁড়াতে বা সভাসমিতিতে উপস্থিত হতে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। দারিদ্র দূর করার নামে দরিদ্রদেরই ঘৃণা করতে শিখেছি। এজাতীয় দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যে ধরণের কর্মকাণ্ড ও শিল্পনগরী ও বাণিজ্য স্থাপন করতে লেগেছিলাম তাতে এক ধরণের এমন শিল্পায়ন হলো যার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক নেই, জনসাধারণের জীবনের সম্পর্ক নেই, এবং যে শিল্পায়ন আমাদের আরও পরাধীন করছে, দারিদ্র বিস্তার করছে দেশের ভিতরে,

অথচ দেশের মৌলিক ধাতুজ ও অন্যান্য পদার্থ সব উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা যখন আজ দেখি গান্ধীজীর মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে, এবং তাঁর Hind Swaraj বই লেখার পঞ্চাশ বছর পরে, তখন হয়তো বুঝতে পারবো কেন গান্ধীজী লিখেছিলেন Industrialise and perish। পশ্চিমী ভোগবাদী আদর্শ কায়েম করতেই আমরা Industrialisation-এর পশ্চিমী ধরণটাকে গ্রহণ করি, এই ভুল লক্ষ্য নিয়ে চলার ফলেই আমরা সামুহিক সর্বনাশ বা perish-এর পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।

নিম্নবিত্তের লোকেরা বা জনসাধারণ এই ব্যবস্থাকে কি করে মেনে নিচ্ছে? অথবা মেনে না নিলেও তাদের সংগ্রাম কেন বারে বারেই ব্যর্থ হচ্ছে, অথবা অন্ধসংগ্রামে পরিণত হচ্ছে? তারও কারণ এই বুর্জোয়া ও নয়াসমাজতান্ত্রিক মুল্যবোধ। দরিদ্রদের যখন বোঝান সম্ভব হয়েছে যে তাদের দারিদ্রটাই একমাত্র শত্রু নয়, সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র দূর করার অর্থ হলো জীবনে উচ্চমানের ভোগবাদ প্রতিষ্ঠা করা তখন তারা কেবল দারিদ্রকেই ঘৃণা করতে শিখলো না, নিজেদেরকেও ঘৃণা করতে সুরু করলো। একটা সর্বব্যাপী অনির্বাণ তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলা হলো এই বলে যে "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে" যেন তাদের কোথাও যেতে হবে, সম্ভব হলে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেও, হয়তো গোটা দেশটাকে নিয়ে ইউরোপ বা আমেরিকাতে পৌঁছতে হবে। সুস্থ সরল সবল জীবনমানে সন্তোষ রইলো না কারো, সবাই উর্দ্ধশ্বাসে উপরের দিকে উঠবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে। সকলকেই ধনী হতে হবে, বিলাসী হতে হবে, ষড়রিপুবর্ধক জীবনবাদ ভোগ করতে হবে। এতে আত্মপ্রত্যয় থাকলো না, স্বপ্রতিষ্ঠ হবার প্রেরণাটা নষ্ট হয়ে গেলো। যাদেরকে তারা তাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করে, বা যাদের সঙ্গে তাদের লড়াই, তাদেরই জীবনাদর্শ যদি তারা অনুকরণ করতে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের শক্তিকে বর্জন করে পরের কাছ থেকে হাতিয়ার পাওয়ার আশায় থাকে, মরীচিকার পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। যেমন আমার নিজের হাতে যে লাঠিটা আছে সেটা ফেলে দিয়ে শত্রুর হাতের বন্দুকটা পাবার জন্য যদি প্রলোভিত হই সে যেমন অসহায় অবস্থা হয়, এও তেমনি। গান্ধীজী যখন স্বনির্ভর হতে বলেছিলেন, সেটা কেবল

অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত লক্ষ্যের দিক থেকেও স্বনির্ভর হতে বলেছিলেন। তবেই না তথাকথিত দুর্বলতম ভারতবাসীকেও, বৃদ্ধা মহিলাদেরও, গান্ধীজী এমন একটা অস্ত্র দিতে পেরেছিলেন, যা তাদের কাছেই আছে, পরের কাছ থেকে ধার করে অস্ত্র-হাতিয়ার জুগিয়ে দিতে চেষ্টা করেন নি। সে অস্ত্রটি ছিল সত্যাগ্রহ, যা অনুগ্রহ বা ভিক্ষা-নির্ভর নয়। নিজের সত্যপ্রতিষ্ঠা থেকেই সে সত্যাগ্রহের জন্ম হতে পারে, অন্যের সত্যের আলোয় মিথ্যা প্রতিফলিত না হয়ে। তার জন্যই কোটি কোটি নিরস্ত্র জনসাধারণ একটা দুর্বার প্রতিরোধের দুর্গ সৃষ্টি করতে পেরেছিল সেদিন; সে হাতিয়ার হলো সত্যাগ্রহ—বা "না" বলার ক্ষমতা, শত্রুর সভ্যতা নয়, অতএব শত্রুর হাতিয়ারও নয়।

কিন্তু পরাগ্রহ বা অনুগ্রহের পথটা বেছে নিতে গিয়ে সত্যাগ্রহের মূল স্পিরিটটাই আমরা হারিয়ে ফেলে অযথা হিংসা ও অহিংসার বুলি একই সঙ্গে আউড়ে চলেছি অর্থহীনভাবে, যেমন একই সঙ্গে অর্থনীতিতে একদিকে স্বয়ংভরতা ও অপরদিকে বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ, বৈদেশিক যন্ত্রপাতি, যানবাহনের জগাখিচুড়ি আদর্শ দেশের উপরে চাপিয়ে দিয়েছি। তাতে অহিংসাও থাকছে না, স্বরাজও থাকছে না, আদর্শের দিক থেকে নানারকমের কপটতার আশ্রয় নিচ্ছি। মুখে এক কথা বলছি, কিন্তু কাজে করছি ঠিক তার উল্টো। এর ফলে আজ যেমন আমরা পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিবাদী সভ্যতার সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাচ্ছি না, অনুন্নত বা উন্নয়নকামী দেশগুলির সংগ্রাম বিফল হয়ে যাচ্ছে, তেমনি আমাদের দেশের ভিতরকার বিপুল দরিদ্র জনসাধারণও তাদের চতুষ্পার্শ্বের প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সত্যিকার কোন সংগ্রাম দাঁড় করাতে পারছে না। দেশের ভিতরে তাই যাবতীয় গণসংগ্রাম অন্ধসংগ্রামে পরিণত হয়ে যায়। আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গেও লড়াই দাঁড়াচ্ছে না, হয়ে যাচ্ছে নানাধরণের কূটনৈতিক বোঝাপড়ার চেষ্টা, যে চেষ্টাতে দরিদ্র দেশগুলির bargaining capacity দিন দিন কমছে বই বাড়ছে না। থার্ড ওয়ার্ল্ড (অনুন্নত দেশগুলিকে নিয়ে) প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে (আমেরিকা ও

রাশিয়া এই দুই প্রধান শক্তিদ্বয়ের নেতৃত্বের দুই ওয়াল্ড´) সত্যিকার কোন শক্তিমান জোট হিসেবে দাঁড়াতেই পারছে না, যেহেতু ভিতরে ভিতরে বা তলে তলে নানা ধরণের একক সুবিধা পাবার প্রলোভনে ভুলে যাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়েই চলেছে এবং সে বিরোধ জিইয়ে রাখার জন্য আবার দুই ওয়াল্ড´ থেকে যে যত পারে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও তার ফলে অর্থ পাবার জন্য অনবরত প্রতিযোগিতা করে তুলেছে। অর্থাৎ কি দেশের ভিতরে, কি দেশের বাইরে সত্যিকার সংগ্রাম দানা বাঁধছে না এবং তা একই কারণে, অর্থাৎ শত্রুর কাছে আদর্শের দিক থেকে মাথা পেতে নিয়ে, শত্রুর আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে গিয়ে, শত্রুর থেকে অনুগ্রহ নিয়ে—শত্রুর বিরুদ্ধেই লড়াই ওঠাবো—এ এক হাস্যকর ও লজ্জাকর প্রচেষ্টা, যা স্ববিরোধী ও আত্মহননকারী পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোকই আজ প্রায় দারিদ্রসীমার নীচে নেমে গেছে। এই দারিদ্রসীমাটা কি, তাও ঘুলিয়ে গেছে। কতো ক্যালোরির খাদ্য পেলে নিম্নতম বা ন্যূনতম জীবনীশক্তি রক্ষা করা চলে, তার মাপেই একধরণের দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করা চলে এবং সেটা হয়তো মাপাও যায়, এবং দূরও করা যায়। কিন্তু অনির্বাণ তৃষ্ণা ও ভোগবাদী বেপরোয়া জীবন চালাতে কতো ক্যালোরি লাগে তা হিসাব করা শক্ত। সে ক্ষেত্রে কেবল খাদ্যই নয়, অন্যান্য ভোগবিলাসের প্রয়োজনে যত এনার্জীর দরকার হবে, তার সোর্স আমাদের নেই, বরং সোর্সটা ফুরিয়ে আসছে। উচ্চমান জীবনের বা ভোগবাদী বা ষড়রিপু-বর্ধক জীবনমানের জন্য যদি আমরা এই বিপুল দরিদ্র জনসাধারণের সংগ্রাম ওঠাতে যাই তা নৈসর্গিক কারণেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা ইতিমধ্যে যারা এই জীবনমানে পৌঁছে গেছে সেই উন্নত দেশের ভোগী উচ্চ-মধ্যবিত্তরা নিজেদের সেই জীবনমানের এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী নয়, তারা ছলে বলে কৌশলে তাদের জীবনমান রক্ষা করার জন্য দরকার হলে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও অনুন্নত দেশগুলির সম্পদ কেড়ে নিতে পিছপা হবে না, এবং সে আগ্রাসী যুদ্ধে কখনো কখনো

অনুচর হিসেবে দু'একটা দরিদ্রদেশের দাবিদাওয়ার কথাও তারা তুলবে —তাদের নিজেদের একান্ত স্বার্থের প্রলোভিত কটু চিত্রটাকে একটু আদর্শ-রঙিন করার জন্য। মতবাদ বা মতাদর্শ বা ideology সেখানে লক্ষ্য নয়, কেবল কাজ হাসিল করার জন্য উপায় বা হাতিয়ার মাত্র হয়ে দাঁড়াবে।

ইডিওলজির বা মতাদর্শের এই অধঃপতন বা দুর্দশা কেন? ভোগবাদের কোন আদর্শগত দম্ভ বজায় রাখা সম্ভব নয়। ভোগবাদে কোন ইডিওলজিরই দরকার করে না। শেষ পর্যন্ত কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হয়ে দাঁড়ায়, ছোট মুখে বড় কথা যোগানের মত। কথাটা স্পষ্ট করেই তোলা যাক্। একদিন ছিল পশ্চিমী জগৎ—আমেরিকার নেতৃত্বে, তারপরে এলো রাশিয়ার নেতৃত্বে দ্বিতীয় জগৎ। এই দুই জগতের মধ্যে ঠাণ্ডা ও তপ্ত লড়াই চলতে চলতে দেখা গেলো এই দুই জগতের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সেই মিলটা কি? উচ্চমান জীবনের মিল এবং ভোগাদর্শের মিল। কমিউনিষ্ট জগতের মধ্যেও যে সকল দেশ ও জাতি দরিদ্র ও জনবহুল সেই অংশটা সচ্ছল ভোগবাদী কম্যুনিস্ট জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো, যেমন চীন, ভিয়েতনাম, এমন কি কিউবা। আর তৃতীয় জগৎটা হলো এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার দরিদ্র অথচ ধনবাদী আদর্শে ও প্রেরণায় পরিচালিত অসংখ্য অনুন্নত সদ্যস্বাধীন (!) দেশগুলি। অতএব প্রকৃতপক্ষে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ (দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে যাদের পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধি আছে তারা আবার একটা নতুন জগৎ বা চতুর্থ জগৎ)—এই সব জগৎগুলি আজ ভেঙ্গে চুরে প্রধানত দুটি জগতে পরিণত হচ্ছে—objective situation-এর তাগিদেই। এই দুটি জগতের একটি হলো সমৃদ্ধ জগৎ—তা ধনবাদীই হোক আর সমাজতান্ত্রিকই হোক, অপরটি হলো দরিদ্র দেশগুলিকে নিয়ে—তারা ধনবাদীই হোক আর সমাজতান্ত্রিকই হোক। পৃথিবীর শেষ সংগ্রাম আজ এই দুটি জগতের মধ্যেই হওয়া উচিত। কিন্তু দরিদ্ররা যদি সমৃদ্ধ জগতের ভাবে, ভাষায়, আদর্শে ও কার্যত ধনীদেশগুলিরই অনুকরণে ভোগবাদী সমাজ স্থাপন

করতে যায়, তবে তাদের লড়াই নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত হতে বাধ্য। দরিদ্রদেশগুলি যদি সত্যিই তাদের দারিদ্র্য দূর করতে চায়, তবে তাদের লক্ষ্য ও উপায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হওয়া দরকার। সেখানে সত্যিকার স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসচেতন স্বনির্ভর লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সত্যিকার সত্যাগ্রহী সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

আজ আমাদের দেশে চিন্তাজগতে যে গোঁজামিল ও জগাখিচুড়ি চলেছে, তাতে গান্ধীজীকেও চাই আবার আমেরিকার মত যন্ত্র-সভ্যতার বাহুল্য ও ভোগবাদও চাই—এ ধরণের একটা বিচিত্র অথচ লজ্জাকর চরিত্র ফুটে উঠছে। আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত মিঃ কাউল এই সেদিনও বলেছেন যে আমেরিকান মূল্যবোধ ও ভারতীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নাকি এত মিল যে এই দুই দেশের মধ্যে বর্তমানে যে মনোমালিন্য চলেছে তা নাকি প্রক্ষিপ্ত বা সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির জন্য! রাষ্ট্রদূতেরা কেন, রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও এ জাতীয় ধারণা আছে। এ জাতীয় চিন্তা চেতনার সঙ্গে গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষের মিল কোথায়, কোথায় গ্রাম-স্বরাজ, স্বনির্ভরতা, কুটির শিল্প, সরল সহজ স্বাভাবিক জীবনাদর্শের মিল? এই আদর্শের মিলের কথা দিয়ে আজকের নব যুবকযুবতী ও শিশুদের যদি ভুল বোঝাই, তবে কুটির শিল্পজাত জিনিসের বাজারটা হবে কোথায়? যে চরকা কাটে সে-ই যদি চরকার সুতোর কাপড় পরতে রাজী না থাকে, সেও যদি নাইলন টেরিলিনের কাপড়-চোপড়ই পরতে চায়, তবে চরকা চলবে কাকে দিয়ে? তাঁতীও যদি নিজের তৈরী কাপড় নিজে না পরতে চায়, তার স্ত্রীও যদি নাইলনের শাড়ী চায়, তবে ভবিষ্যৎ কী তাঁতের? গ্রাম্য মুচীর তৈরী চটি জুতা যদি গ্রামের লোকেরাও বর্জন করে চলে, তবে সে চটি বিক্রী হবে কোথায়? অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতেরা বা ব্যবসাবিদেরা দেখাচ্ছেন বুঝিবা আমাদের কুটির শিল্পের উৎপাদন বিদেশে চালান হবে, কেননা আমেরিকানরা নাকি এসব হাতে তৈরী জিনিষের প্রতি খুবই লুব্ধ! কুটির শিল্পের বাজার খুঁজতে হচ্ছে বড় বড় শহরে বা বিদেশে! গ্রামে বা দেশে তার স্থান নেই, চাহিদা নেই। আশ্চর্য এই প্রতারণা! এই প্রতারণা দিয়ে আমরা তৈরী করতে চাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ, আর গান্ধীজীর স্বয়ংভর স্বরাজ!

আসলে স্বদেশীর সঙ্গে আজ আর আমাদের বর্তমান স্বয়ংভরতার স্বপ্নের কোন সম্পর্ক নেই। তার কারণ আদর্শের ক্ষেত্রেই লুকোচুরি, আমেরিকান ঢং-এ স্বদেশী, স্বরাজ ও স্বয়ংভরতার জন্য মত্ততা বা উন্মাদ প্রেরণা।

সম্প্রতি একজন বিদেশী ভদ্রমহিলা কিছুদিন ভারত ভ্রমণ করে একজন ভারতীয় বন্ধুকে অনুযোগের সঙ্গে বললেন যে ভারতবর্ষের মহিলাদের কোন চরিত্র আছে বলে তাঁর মনে হলো না; অবশ্য তাঁর উচ্চমধ্যবিত্ত মহিলাদের সঙ্গেই পরিচিত হবার সুযোগ মিলেছিল। কেন, প্রশ্ন করতে বিদেশী মহিলাটি বললেন যে ভারতীয় ভদ্রমহিলারা মনে করেন যে সেক্সটাই বোধহয় তাঁদের একমাত্র সম্পদ, এবং এই সেক্সটিকে যতদূর সম্ভব ভাঙ্গিয়ে খাবার তালেই তারা আছেন, নিত্য নতুন সাজগোছ নিয়েই এবং তৎজাতীয় হালচাল চলন নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত। এ ছাড়া মানুষ হিসেবে তাদের যে আর কোন চরিত্র আছে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। ভারতীয় বন্ধুটি এ কথার কোন জবাব দিতে পারেন নি, তিনি কেবল দেখাতে চেস্টা করেন, খেটে খাওয়া মেয়েদের ও মায়েদের সে জাতীয় চরিত্র নয়, এবং তারাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। কিন্তু আমরা তো জানি, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ও খুবই লঘিষ্ঠ হলেও এরাই আজ সমাজের pace setter, এরাই বিপুল খেটে খাওয়া দরিদ্ররমণীদের ও মায়েদেরও ভোগবাদী ষড়রিপুবর্ধক সভ্যতার স্বর্ণমৃগ দেখিয়ে তাদের চরিত্রও নষ্ট করছে, তাদের চিন্তা-চেতনাতেও একটা হীনমন্যতা সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসরে ভারতীয় নারীদের বর্তমান এই লক্ষ্যচ্যুতির কথা মনে রাখা দরকার। মহিমময়ী মা, সুসন্তানের মা হবার আদর্শটা কোথায়, রমণীর রমণীয়তার উৎকর্ষ সাধনেই যে সবাই ব্যস্ত। অথচ নারী জাতি গোটা জাতির চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে তার বিরাট দায়িত্বের কথা ভুলতেই বসেছে। এটি একটি বিক্ষিপ্ত বা সংক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, এর সর্ব-ব্যাপক তাৎপর্য ভুললে চলবে না। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন একটা বিদেশী বিদ্বেষ বলে উড়িয়ে দিলে নিজেদেরই সর্বনাশ হবে। গান্ধীজীর নারীজাগরণের সঙ্গে এর মিল কোথায়? এই সব রমণীরা আমাদের শক্তিস্বরূপা হতে পারে?

শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনের সার্থকতা বা success কাকে বলে, গান্ধীজীর বা চিরন্তন ভারতের মানদণ্ডটা কি, এ সম্বন্ধে একটু বলেই ক্ষান্ত হতে চাই। ষড়রিপুবর্ধক পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধনাতে মনুষ্যত্বের পরম বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ একটা আগ্রাসী যন্ত্র নয়। মানুষের প্রধান সম্বল হলো তার মন। এই মনের বিকাশ চিত্ত, বুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ও ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনাপূর্ণ। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যেই মানুষ সবকিছু উপভোগ করে না, উপভোগ করে মন। মনটাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে, fatigued বা শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন করে দিয়ে, ইন্দ্রিয়ের সাধনা করলে সত্যিকার উপভোগ শক্তিটাও নষ্ট হয়ে যায়। মদ খেয়ে বমি করে ফেলে, আবার তক্ষুনি মদ খেতেও দেখেছি। মদমাতাল সত্যিকার মদমাতালও হতে পারে না। এইমাত্র খেয়ে তক্ষুনি খিদেটাকে জাগরিত করার জন্য শক্তিমান হজমী দাওয়াই খাওয়ার মত নিরর্থক এক প্রয়াস জীবজগতে বাঘেদেরও নেই। এই ভোগ-মত্ততা অদ্ভুত, এ পাশবিকও নয়, তারও চেয়ে অধম। বিশ্বের যাবতীয় ক্ষুধাকে একমাত্র নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বলে ধরে নিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় জীবজগতকে ধ্বংস করতে আজ আমরা পাগল। গাছ-গাছড়া, পশুপক্ষী, কোন কিছুরই যেন বাঁচবার অধিকার নেই, তাদের বাঁচবার একমাত্র দাবি হলো যদি তারা মানুষের অনন্ত শারীরিক ক্ষুধার খোরাক হতে রাজী থাকে তবেই। এই ষড়রিপুসর্বস্ব মানব জাতি আজ পৃথিবীর শেষ দানব—যে দানব কখনো হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে পারে না, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এতটুকু বিরাম নেবার তার সময় হতে পারে না, সে ধনবাদী দানবই হোক আর সমাজতান্ত্রিক দানবই হোক। তথা-কথিত পুষ্টিকর খাদ্যের তাড়নায় একদিন এরা মানুষের মাংসও খেতে শুরু করতে পারে—তা নইলে পৃথিবী এদের হাত থেকে মুক্তি পাবে কেমন করে? একদা অতিকায় জন্তুজানোয়ারেরা—ডাইনোসর জাতীয় অতিকায় পশুরা, এই পৃথিবীতে পদচারণ করে বেড়াতো। তারা আজ কোথায়? শরীর-সর্বস্ব ভোগচেতনা আজ মানুষের কাছে অতিকায় মানুষের সাধনাতে পরিণত হতে চলেছে; অতিমানুষ বা মহামানুষ নয়, অতিকায় মানুষ-এর সাধনা চলছে। এ মানুষ সহজ সরল সুন্দর জীবনের

সাধনাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে বর্জন করেছে, সরল জীবন ও উন্নতমনা মানুষ আজ এদের চক্ষে মূর্খ।

রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করি—

ঝড়ের বেগেতে চলেছি কোথায়
এ যাত্রা মোর থামাও।

ভারতের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে কারা ?

ডঃ ফকরুদ্দীন আহমেদ

(আলিগড বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি বিভাগের প্রধান)

আর কতকাল আমাদের খনিজ পদার্থের উৎসগুলো (Mineral Resources) চালু থাকা সম্ভব ? আকরের উৎস নিঃস্ব হয়ে গেলেই বা কি হবে ? আমরা এইসব অমিতসম্ভাবনাসম্পন্ন আকরগুলোকে অসমীচীন ও অসঙ্গতভাবে যদৃচ্ছ বিনষ্ট হতে দিয়েছি। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আমাদের পরিচয় থাকবে—বিবেচনাহীনভাবে সমস্ত বহুমূল্য উৎসের বিনষ্টকারী হাঙ্গর রূপে।

খনি থেকে কয়লা আহরণের বেলায় আমরা এক মিটার বা দেড় মিটারের কম গভীর স্তরকে নষ্ট হতে দিয়ে থাকি। ইংলণ্ডে মাত্র তেইশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পুরু স্তরের আকর উত্তোলন করা হয়। আমরা একটি কার্যকরী মাত্রা ঠিক করে নিয়ে, সেই মাত্রা লক্ষ্য করে খনিজ পদার্থ আহরণ করে থাকি। এখানে ওখানে অনেক আকরিক খনিজবস্তু ছেড়ে ফেলে আসা হয়, যেহেতু আকরিক পদার্থ নির্ধারিত লাভনির্ভর (Economic) মানের সামান্য নীচে রয়েছে। এসব মূল্যবান আকরিক পদার্থ খনিজ গহ্বরে ফেলে আসার সময়ে এমন কোন ব্যবস্থা বা সুযোগ রেখে আসা হয় না যাতে উচ্চমানের পদার্থ শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে গিয়ে ওখানে ফেলে আসা অল্প নীচুমানের পদার্থকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হতে পারে। তাই বহু ক্ষেত্রেই এসব সামান্য নীচুমানের আকরিক পদার্থকে আর কখনো উত্তোলন করা সম্ভবপর হয় না।

তিরিশ বছর আগেও ২·৩ শতাংশ তাম্রভাগযুক্ত তাম্র-আকর অকেজো বলে মনে করা হোতো। এমন কি ২·২ শতাংশ ভাগের তাম্র-আকরকে

খনির মধ্যেই ফেলে রাখা হোতো—অকেজো 'আন-ইকনমিক' মনে করে। এখন কিন্তু ফেলে রাখবার নিম্নমান হোলো ১'২ শতাংশ ভাগযুক্ত আকর। সে সময়ের পরিত্যক্ত অনেক খনি বা মাইন্‌কে এখন আর কাজে লাগান সম্ভব হচ্ছে না, যেহেতু পুনরায় চালু করার জন্য কোন সুযোগ বা ব্যবস্থা রেখে আসা হয়নি। এভাবে কত সহস্র টন্‌ আকরিক পদার্থের পুনরুদ্ধারের সব সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে চিরতরে বিনষ্ট করা হয়েছে, কে বলতে পারে? ষাট শতাংশের কম লৌহভাগযুক্ত আকরকে এখনো আদৌ স্পর্শ করা হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডে তেইশ শতাংশ ভাগের এবং জার্মানীতে তিরিশ শতাংশ লৌহভাগযুক্ত আকরকে লাভজনকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। উচ্চমানের আকর তুলতে গিয়ে যদি ৫৫ শতাংশ লৌহভাগের আকরকে ফেলে এসে নষ্ট হতে দেওয়া হয়, তাহলেও আমাদের মনে কোনো দাগ কাটে না বা নজরে আসে না। ভবিষ্যতের বিষয়ে আমরা একান্তই নির্বিকার।

আমাদের দেশে, বলতে গেলে পৃথিবীর সব দেশেই, বিশ বছরের কাজ চলার মত আকরিকের সঞ্চয় দেখতে পেলেই খনিজ পদার্থ তুলে আনতে লেগে যায়। সঞ্চয় বা জমার পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহলে উত্তোলনের মাত্রা বৃদ্ধি করে বিশ বছরের মধ্যে সব তুলে ফেলতে চেষ্টা পাই। গৃধ্নু লোভাতুরের মত অতি সত্বর অর্থ কুড়িয়ে আনার চেষ্টাই একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। একথা তলিয়ে দেখা হয় না যে বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর জাতির পক্ষে একটুকু মুহূর্ত বইতো নয়। দুর্ভাগ্য। অংশীদারগণই কর্মের রূপকার হয়ে বসে নীতি নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে—লভ্যাংশের দিকে, শেয়ারের মালিকানা কুক্ষিগত করার দিকে, কুক্ষিগত অংশের মূল্যের দিকে, বাজারে শেয়ারের দাম ওঠা-নামার দিকে, কোম্পানী কাগজের বিনিময় কেন্দ্রের (Stock Exchange) দিকে, এবং বিভিন্ন ভাবে আয়ের পরিমাপ ও প্রতিযোগিতার দিকে। পরিস্থিতিটা নেহাত বাতুলতার সংক্রামক ব্যাধি—দুর্দম্য মতিভ্রান্তি।

খনিজ দ্রব্য তো আর ক্ষেতের ফসলের মত নয় যে বছরের পর বছর ধরে ফলিয়ে চলা যায়। খনিজ দ্রব্য অরণ্যের বৃক্ষরাজির মতও নয় যে প্রতি পঞ্চাশ বছর পরে কেটে আনা যায়। খনির অভ্যন্তরে অবস্থিত আকরিক

বস্তু আহরণ করে নিলে পুনরায় জমে গিয়ে গচ্ছিত হয়ে থাকতে পারে না। চল্লিশ পঞ্চাশ আশি বছর বাদে যখন খনিজ পদার্থের সব উৎস নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন কোন্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে? এমন কি ভবিষ্যতে আবিষ্কার হতে পারে, অথবা নিম্নমানের জমে থাকা খনিজ পদার্থকে খুঁজে বার করে তুলে আনতে আরও কত গভীরে যেতে হবে, পূর্ব পরিত্যক্ত আকর থেকে আরো কিছু ধাতু বা অন্য আকরিক পদার্থ তুলে আনতে সমর্থ হব কি না,—আর অসমর্থ হলেই বা কি করা যাবে? ভূবিদ্যা, ভূবিদ্যা সংশ্লিষ্ট রসায়ন-পদার্থবিদ্যা, গগনপথে অন্তরীক্ষে পরিক্রমা করে ম্যাগনেটো-মিটারের সাহায্যে সন্ধান চালানো, গভীর হতে গভীরতর পথে পৃথিবীর বুকচিরে চলা—সব সমীক্ষাই চালান হচ্ছে নতুন নতুন গবেষণালব্ধ জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে আকাশচারীরূপে। সব কিছু প্রচেষ্টা চলেছে খনিজ বস্তু আবিষ্কারের সন্ধানে।

সেদিন বেশী দূরে নয় যখন আমরা জানতে পারবো, মাতা বসুন্ধরার দান করার মত আর কি বাকী আছে। একবার জ্ঞানের গোচরে আসলেই বিশ তিরিশ বছরেই সব শেষ করে ফেলা যাবে। সর্বশক্তি নিয়োজিত হচ্ছে খনিজ বস্তু লাভের তীব্র অতৃপ্ত ক্ষুধার তাড়না থেকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—যেসব ক্ষেত্রে ১·২ শতাংশ পরিমাপের তাম্র বিদ্যমান সেসব ক্ষেত্রেই এখন আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কোনো কোনো জাতি ০ ৮ শতাংশ তাম্রভাগযুক্ত আকর নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। আমরাও অধুনা খেত্রীতে গড়ে ০·৮ শতাংশ তাম্রভাগের (সর্বনিম্ন ০·৫ শতাংশ) আকর নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছি। বর্তমান বাজারে নিশ্চয় এটা পড়তাসুলভ (Economical) হবে না। কিন্তু কেনই বা নয়? বোঝাটা চাপবে শুল্ক প্রদানকারীদের ওপরে—পরিচালকমণ্ডলী বা ম্যানেজমেণ্টের ওপর নয়। মন্ত্রীকেও প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে না। 'যদি' দরকার হয় আমরা আবারও খেত্রী বা পৃথিবীর অন্য যে কোনো খনিতে যেতে পারি। এই 'যদি'টা খুব একটা প্রকাণ্ড 'যদি' হয়ে দেখা দেবে যদি আমরা ০·৬ শতাংশ, ০·২ শতাংশ, এমন কি ০·১ শতাংশ তাম্র আকর পর্যন্ত কর্যাকর করতে যাই। কিন্তু কোনো একদিন শেষ হতে চলেছে সমগ্র তামার উৎস। হাঁ, আমি জানি, আরো সামান্য

আকর (Bonanza) আছে। তবু বলবো সেদিন আর বেশী দূরে নয় যখন সমগ্র সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। একদিকে বৃদ্ধিপাচ্ছে প্রয়োজন, অপরদিকে শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রাপ্তির সম্ভাবনা। তখন কি পরিস্থিতি দেখা দেবে, যখন থাকবে না তামা, সীসা, দস্তা, নিকেল, ক্রমিয়াম, রূপা, সোনা? আরো বলতে গেলে—যখন থাকবে না লাইমস্টোন্, মাইকা, ম্যান্‌গানিজ্, ম্যাগ্‌নেসাইট—যখন থাকবে না টাংস্টেন, গ্রেফাইট্, মলিব্‌ডেনাম। ভেবে দেখুন, ২০৭৩ বা ২১৭৩ সালে কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হোতে হবে! একবার ভেবে দেখুন। সেতো আর বেশী দূরে নয়। হয়তো সে সময়ে থাকবে কিছু লৌহ আকর,আর মাটি বা বালি থেকে তৈরী করা এলুমিনিয়ম ধাতু। কিন্তু তার প্রস্তুতি পড়তা উঠে যাবে সীমাহীন উচ্চ স্তরে। সেই লৌহ আকর কোনোটাই কি ব্যবহারোপযোগী হবে? ধরা যাক সূর্যে অফুরন্ত শক্তি নিহিত আছে। উষ্ণপ্রস্রবণ, জলপ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্র প্রবাহকে প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে শক্তির (Energy) উৎসরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। কিন্তু সেই শক্তিপ্রবাহকে বহন করার জন্য প্রয়োজন হবে ধাতু। শক্তিউৎপাদক যন্ত্রে (Generator) প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণ তাম্রধাতু। তাম্রের অভাবে গ্রহণ করতে হবে রূপা-ধাতু। এলুমিনিয়াম হবে খুব নিম্নমানের শক্তি পরিবাহক বিকল্প ধাতু। আমেরিকাতে তেজশক্তি উৎপাদনের জন্য এক প্রকার পেটিকা (Fuel Box) আবিষ্কৃত হয়েছে। সে পেটিতে থাকে না কোনো ঘূর্ণায়মান অবস্থা-প্রাপ্ত ধাতু। কিন্তু সেই পেটিকার অভ্যন্তরে জ্বালানী হিসেবে কাজ করে কেরোসিন জাতীয় দাহ্যবস্তু। ধরা যাক যে সূর্যের তাপ হবে সেই জ্বালানীর উৎস। তাহলেও সেই শক্তিকে পরিচালন পরিবহন করার জন্য প্রয়োজন হবে ধাতুজাতীয় পদার্থ। বিনা ধাতুতে কি আর তৈরী হবে car বা গাড়ী, তৈরী হবে কি কলকারখানা, রেলপথ, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদি? লৌহ-কঠিন প্লাস্টিক তৈরী হয়েছে সত্যি। কিন্তু সেসব প্লাস্টিকে উৎপাদনে প্রয়োজন হয় কয়লা-ঘটিত উপাদানের। প্লাস্টিকে নির্মিত অনেক যন্ত্রাংশই প্রস্তুত হয় ধাতুর যোগসাজসে। সব জিনিসেই যে ধাতুর প্রয়োজন!

সম্মুখের দিকে যতটা দৃষ্টি চালানো যায় তাতে দেখা যায় যে লৌহ-আকরকে বাদ দিলে বালি ও বালি-পাথরকে কাজে লাগিয়ে কাঁচ

বানিয়ে ধাতুর পরিবর্তে ব্যবহারের একটা রাস্তা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের জলকে শুকিয়ে নিয়ে তলা থেকে বালিমাটি বার করে নিয়ে হয়তো সেই মাটি থেকে এলুমিনিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। কিন্তু সেই এলুমিনিয়াম হয়ে দাঁড়াবে এখনকার বাজারে সোনার তুল্য মুল্যের। কিন্তু সেই গচ্ছিত ধাতুই বা কতকাল স্থায়ী হবে? সব বেসাল্ট (Basalt) জাতীয় পাথরে কিছু তামা ও অন্য কিছু ধাতু থাকে। তা হোলো প্রতি মিলিয়ন টনে দশ, বিশ, ত্রিশ অংশ। কাজেই প্রতি মিলিয়ন টন অতি কঠিন পাথর গুড়িয়ে নিয়ে তাকে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চালিত করে, মাত্র দশ, বিশ, ত্রিশ টন তামা এবং সমপরিমাণ অন্য কোন ধাতু পাওয়া যাবে হয়তো। কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন টন এইসব অতি কঠিন পাথরকে কেটে তুলে নিতে লাগবে প্রচুর সময় ও অর্থ— তার ওপরে লাগবে বলবিজ্ঞান শক্তি, পাওয়ার বা এনার্জি। কিন্তু আমাদের তো একান্ত অনটন চলেছে পাওয়ারের। তা হোলে কি পাওয়ারের আরো গুরুতর ঘাটতি দেখা দেবে না?

সমুদ্রের তলায় এবং দ্রবিত তরল অবস্থায় প্রচুর ধাতব পদার্থ সঞ্চিত রয়েছে বলে প্রচার করাটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। এটাও একান্ত অবিবেচনার পরিচয়—নেহাৎ ধোঁকা মাত্র। আজও যা জানা আছে তাতে মনে হয়, শুধু ম্যান্‌গানিজ, ফস্‌ফেটিক্‌ ও লৌহঘটিত কিছু ঢিপি (Nodule) বা চাঙ্গড় রয়েছে। সেই ঢিপিতে রয়েছে কিছু সীসা, দস্তা, রাং, ইউরেনিয়াম, নিকেল ইত্যাদি—রয়েছে মাত্র তিন শতাংশরূপে। কিন্তু তাও বেশী নয়—বলতে গেলে কয়েক দশক সময় মাত্র চলতে পারে। এই নডুলগুলো সমুদ্রের গভীরতর তলদেশে রয়েছে বলে তাদের আঁচড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে নতুন ধরণের যন্ত্রযানের। নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য পরীক্ষা চালিয়ে চলেছে জাপান ও আমেরিকা। তাতেও খরচ হবে সীমাহীন (প্রহিবিটরী) আকারে। আর আমাদের পক্ষে তিন সহস্র, ছয় সহস্র মিটার তলা থেকে তুলে আনবার শক্তি বা পাওয়ারই-বা কোথায়?

অবশ্য জলস্রোতের তলায়ও কিছু বালি পাথর রয়েছে। আমরা যেভাবে বিশ ত্রিশ বছরের ওয়াদায় কাজ চালিয়ে চলেছি তাতে এ সঞ্চয়ও শেষ হতে চলেছে। এমন কি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় জমে থাকা

লৌহ আকর হিমেটাইট্ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা আরো কঠিন হচ্ছে। যত নিম্নমানেরই হোক না কেন, লৌহ নিষ্কাশনের কাজে প্রয়োজন কয়লার। কিন্তু যেভাবে যতটা খরচ হচ্ছে, পরে কি আর ততটা পাওয়া যাবে? ভবিষ্যৎ প্রকল্পের প্রয়োজনেই বা কতটুকু পাওয়া যাবে?

ভারতে খনিজ পদার্থের অবস্থা (প্রতি হাজার টন হিসাবে)

সাল	ধারণ শক্তি	কার্যকরী উৎপাদন	প্রয়োজন	আমদানী	আমদানির মূল্য: প্রতি কোটি টাঃ হিঃ
তামা					
৬৩-৬৪	—	৯,৫০০	—	৭৪,০০০	২৫·৩৮
৬৮-৬৯	—	৯,৩০০	—	৪১,০০০	৩৯·১৭
৭১-৭২	১৬,৫০০	৮,৩০০	৯০,০০০	৫৬,০০০	৫৬·১৮
৭২-৭৩	১৬,৫০০,	১২,৫৯৬	—	—	—
সীসা					
৬৩-৬৪	—	৩,৫০০	—	৩৬,১০০	৩·০২
৬৮-৬৯	—	১,৯০০	—	৩২,৮০০	৬·৪০
৭১-৭২	৬,০০০	১,৭৭০	—	—	—
৭২-৭৩	—	১,৮২০	৭৪,০০০	—	—
৭৮-৭৯	—	—	১১৮,০০০	—	—
দস্তা					
৬৩-৬৪	—	—	—	৮৫,৯০০	৯·৪৮
৬৮-৬৯	—	২৫,০০০	—	৯০,০০০	১৯·৯০
৭১-৭২	৩৮,০০০	২৪,৬১০	—	—	—
৭২-৭৩	—	২৩,৫১১	১২০,০০০	—	—
৭৮-৭৯	—	—	২০০,০০০	—	—
নিকেল					
৬৩-৬৪	—	—	—	১,৮৫৯	১·৫৫
৬৮-৬৯	—	—	—	২,৫০০	৫·৭০
৭৩-৭৪	—	—	—	৩,৬০০	—

যে হারে আনন্দ করে আমরা উচ্চমানের লৌহ আকর রপ্তানি করে চলেছি, বলতে গেলে একশত বছরের পরে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আর রপ্তানিই বা করা হচ্ছে কিসের প্রয়োজনে, কিসের বিনিময়ে! একশত আঠার কোটি টাকা মূল্যের লৌহ আকর জাপানে বা অন্য দেশে রপ্তানি করে তার বিনিময়ে দু'শত বিয়াল্লিশ কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাত ও অন্য এলয় (Alloy) আমদানি করে থাকি। এর মধ্যে একমাত্র লৌহ ও ইস্পাতের মূল্য একশত পঁচিশ কোটি টাকা। বন্দর থেকে বেইলেডিলা (Bailadila) পর্যন্ত রেল লাইন তৈরীতে খরচ হয় বহু শত কোটি টাকা। আবার বন্দর থেকে সেই আকর রপ্তানির সুযোগ সুবিধা বিধানের জন্যও খরচ হয় বহু শত কোটি টাকা। যদি বিশেষ এলয়-ইস্পাত (Alloy Steel) তৈরী করার কারখানা বানাতে এর সামান্য অংশ মাত্র ব্যয় করা হোতো, যদি তৈরী হোতো আরো কয়েক জোড়া বা আরো বেশী কারখানা, যদি আরো খরচ করা হোতো বর্তমান কারখানাগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে—তাহোলে এমন অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো না। আমাদের গোটা পরিকল্পনাটাই ওলট্-পালট হয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় এসে যায়নি কি?

যুদ্ধ-পূর্বকালে লৌহ-আকর রপ্তানি না করে কিছু সামান্য প্রক্রিয়ার মধ্যে চালিয়ে নিয়ে কাঁচা লৌহপিণ্ড (Pig Iron) তৈরী করে রপ্তানি করা হোতো। বস্তুতঃ সে সময়ে আমাদের তৈরী পিগ্ আয়রণ পৃথিবীতে সবচেয়ে সস্তা ছিল। যুদ্ধোত্তর কালে অস্ট্রেলিয়া এলো বাজারে। তাদের রিসোর্স বা উৎস ছিল আরো বড় আকারের। কিন্তু তাদের অভাব ছিল মজুরের—আর সে দেশ চলতেও চায়নি নিজে কারখানা চালাবার পথে। প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা রাজী হলাম লৌহ আকর (Iron ore) চালান দিতে—কিন্তু বলতে গেলে এ ব্যাপারে কোনোই সমর্থনযোগ্য যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। জাপান যদি আমাদের অপরিশোধিত লৌহ পিণ্ড (Pig Iron) নেবার আগ্রহ না দেখাতো, তাহোলে অন্য কোনো দেশ হয়তো আগ্রহ দেখাতো, অথবা আমরা নিজেরাই বেশী পরিমাণ ইস্পাত তৈরী করতে এগিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু আমরা ভিন্ন পথে মনোযোগী হয়ে অন্যভাবে Resources

নিয়োজিত করে নগদ মামুলী অর্থ প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাদের Iron ore ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে সস্তা, আমাদের ইস্পাত ছিল সবচেয়ে ব্যয়সাধ্য। আমাদের প্রয়োজন ছিল নতুন পথে এগিয়ে গিয়ে গবেষণার ওপর বিশেষ নজর রেখে বহুমুখী সহযোগিতা লাভ করে, এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলা। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক ধাতুবিদগণ বরং বিদেশে গিয়ে কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বিদেশ থেকে জ্ঞান আমদানি করবেন। কিন্তু লৌহ-আকর (Iron ore) রপ্তানি করতে রাজী হওয়া কিছুতেই চলতে পারে না। লৌহ-আকর রপ্তানি করে জাপানের সবরকম প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত ছিল অস্ট্রেলিয়া। তাহোলে, তা করতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। প্রয়োজন ছিল, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের আকরকে আঁকড়ে জমিয়ে রাখা। তা না করে, আমরা অতি উৎসাহে লাফিয়ে বাজারে প্রবেশ করে সুযোগের পর সুযোগ দিতে লাগলাম ক্রেতাদের—দেওয়া হোতে লাগলো সুযোগ, আরো সুযোগ।

মাত্র একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি। কয়েক দশক আগেও উচ্চমানের ম্যান্‌গানিজের বেলায় আমরা ছিলাম সুবৃহৎ প্রস্তুতকারী। যে কেউ মূল্য দিতে পারলেই ক্রয় করতে পারতো সেই ম্যান্‌গানিজ। স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে অনেক অতিরিক্ত পরিমাণ খরিদ করতে এত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোতো যে ভবিষ্যতের জন্য রাশীকৃত জমিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে তাদের পক্ষে। সর্বোত্তম জিনিস চলে যাওয়াতে এখন আমাদের সঞ্চয় রয়েছে খুবই নিম্নমানের। এই পথে আমাদের হাতে কিছু টাকা-পয়সা এসেছে বটে। কিন্তু সেই পথে অপরে হয়েছে ধনী, আর আমরা এখন সামান্য Torch-cell-এ ব্যবহারের জন্য বা অন্য কোনো শিল্পের প্রয়োজনে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকি ম্যান্‌গানিজের জন্য। আগেকার দিনে এক সময়ে পৃথিবীর বৃহৎ ম্যান্‌গানিজ প্রস্তুতকারী—আর এখন হয়েছি এই শিল্পে সবচেয়ে নিঃস্ব। এখন আমরা লাভ সুবিধার কথা ভেবে থাকি, এককালে অকেজো পরিত্যক্ত জিনিসকে ব্যবহার করে লাভ সুবিধা নেওয়ার কথা চিন্তা করে থাকি। এমনকি এক সময়ে কেটে নিঃশেষ করে ফেলে রাখা মাইনের মধ্যে দেয়াল হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও, এমনকি এখনও ভালমানের আকর

রপ্তানি করে চলেছি; প্রতি বছর এক মিলিয়ন টনের বেশী রপ্তানি করা হয় আর আমরা নিজেরা ব্যবহার করে থাকি নিম্নমানের পদার্থ। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের জন্য জমা আছে উচ্চমানের বস্তু। তবু নিবৃত্ত হইনি আমরা রপ্তানির ব্যাপারে। পরিকল্পনাই বটে! এতেও যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারি, না পারি সময়োপযোগী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, এখনই, এই সময়ে—তাহোলে সর্বপ্রকার মিনারেল রপ্তানির ব্যাপারে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এর পরেই হয়তো আসবে অভ্র (Mica), ক্রোমাইট (Chromite), কেয়ানাইট (Kyanite) অথবা সিলিমেনাইট (Silimanite)।

ম্যান্‌গানিজ কিছুটা দুষ্প্রাপ্য মিনারেল। গত দশ বছর যাবৎ ভারতে উৎপাদিত ম্যান্‌গানিজের ৭৮ শতাংশ রপ্তানিতে চলে গেছে। ১৯৩০ সালে উৎপাদন ১১ শতাংশ কমে গিয়ে ১৯৩০ সালের ১·৮৪ মিলিয়ন টন থেকে ১·৬৩ মিলিয়নে নেমে গেছে। গোয়া, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং মাইশোরের ম্যান্‌গানিজ উৎপাদন বেশ নেমে গেছে। ওড়িষ্যার উৎপাদন ছিল সবচেয়ে ওপরে (৪২৫,৯২৭ টন), তারপর মধ্যপ্রদেশ (২৩৩,০৯৬ টন) এবং তার নিম্নে মহারাষ্ট্র (১৮০,৫১৪ টন)।

দেশের ম্যান্‌গানিজ আকর বেশ কমেছে—আবার এদিকে চাহিদা বেড়েই চলেছে। এই দশকের শেষে হয়তো ২·৭ মিলিয়ন টন প্রয়োজন হবে। আমরা কি সে দাবী মেটাতে সক্ষম হব ?

এখন সরকার রপ্তানি ক্রমশঃ কমিয়ে নিতে চাইছেন। নতুন উৎসের খোঁজে গবেষণার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলাতে, মহারাষ্ট্রের ভান্দ্রা এবং নাগপুর জেলাতে নতুন করে খোঁড়াখুড়ি চালানো হচ্ছে। বিহারে সিংভূম জেলাতে ও ওড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলাতেও প্রাথমিক সার্ভে বা নিরীক্ষা চলছে।

বিশেষ যুক্তি দেখানো হয়েছে, সর্বপ্রকার ধাতুর একান্তভাবে রপ্তানি বন্ধ করার বিষয়ে। রপ্তানি বন্ধ রাখার প্রতিষেধক ও পরিপূরক হিসেবে বলবো, সর্বপ্রকার জ্বালানি পদার্থের আমদানি বন্ধ রাখতে। তাহোলে অভিশপ্ত বৈদেশিক বিনিময় অর্থ লাভের প্রলোভনের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, প্রতি বছরে বিদেশ থেকে একশত কোটি টাকার

মূল্যে ১২-মিলিয়ন টন তরল জ্বালানি পদার্থ আমদানি করে থাকি। এই একশত কোটি টাকা হোলো সামগ্রিক মিনারেল আমদানি বাবদ বাৎসরিক ব্যয়ের ষাট শতাংশ। আবার এই মিনারেল আমদানির চাহিদা বেড়েই চলেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে (এখন ১৯৩০ সালের আগস্ট মাস) আমাদের বৈদেশিক মন্ত্রী বিদেশে গিয়ে, বিদেশ থেকে আরো বেশী তেল আমদানির কথা চালিয়ে এলেন। এই ব্যাপারটা ভবিষ্যৎ প্রবণতার দিক থেকে কিসের নির্দেশক? তেল আনতে গিয়ে আমাদের বৈদেশিক কলাকৌশলের পথে চলতে হচ্ছে—মামুলী বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় মেলামেশা চালাচালির পথে নয়। এখন আর শুধু 'ফেল কড়ি মাখো তেল' নয়। যারা তেলের মালিক তাঁদেরকে হিউমার করতে হবে, করতে হবে পরিতোষণ!

১৯৪৫ সালে ভারত সরকার কৃত্রিম (Synthetic) পেট্রল প্রস্তুত করার কথা চিন্তা করেছিলেন। তখন জানা ছিল যে জার্মানী সিন্‌থেটিক্ পেট্রল, ডিজেল ও লুব্রিকেণ্টের (Lubricant) ওপর নির্ভর করে চালিয়ে ছিল একটা যুদ্ধ। লুনা (LEUNA), সল্‌ভেন্ (SCHOLVEN), জেল্‌সেন্‌বার্জ (GELSENBERG), পোলিজ (POLITZ), (WESSELING) ওয়েস্‌লিং প্রভৃতি পাঁচটি স্থানে অবস্থিত কারখানা থেকে পেট্রল তৈরী হচ্ছিল। লুনা কারখানা চালু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯২৭ সালে। ১৯১৩ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে বার্গুইজ (BERGUIS) ও ফারবেন্ (FARBEN) এর প্রযুক্তিবিদ্যার শিল্পবিজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। অতি নিম্নমানের তামাটে (Brown) রং-এর কয়লার সঙ্গে হাইড্রোজেন-এর (Hydrogen) সংযোগ সাধন করে প্রস্তুত হয়েছিল এই তরল দাহ্যবস্তু। এক সময়ে ভারত সরকার Geological Survey of India বিভাগকে বলেছিলেন দামোদর ভ্যালী এলাকাতে কয়লার খোঁজ করতে, যাতে সেই কয়লা দিয়ে সিন্‌থেটিক্ পেট্রলিয়াম প্রস্তুতের কারখানা চালান যায়। জিওলজিকেল্ সার্ভে তো তা সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলো এসে, পরদার আড়ালে খেলা শুরু করে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। তারা বিশেষ করে বোঝাতে লাগলো যে

সিন্‌থেটিক্ পেট্রোলিয়ামের পড়তা খরচ স্বাভাবিকভাবে পাওয়া প্রাকৃতিক পেট্রোলের দামের চেয়ে বেশী হবে। তাই এই সিন্‌থেটিক্ প্রসেসে হাত দিলে শুধু অর্থের অপপ্রয়োগ হবে। ওদের যুক্তিটা ছিল অর্থশাস্ত্রের মামুলী অর্থনীতি। কিন্তু আমি বলবো, নেহাৎ নির্বোধের যুক্তি। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, সিন্‌থেটিক্ কারখানার বিকল্প হিসেবে শোধনাগার (Refinery) তৈরী করার। প্রাক্-স্বাধীন-ভারত চেয়েছিল সিন্‌থেটিক্ জ্বালানি তৈরীর জন্য কারখানা বানাতে—আর স্বাধীনোত্তর ভারত কবরের গহ্বরে রেখে দিলেন সেই প্রস্তাবকে। সে কবর এত গভীর যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২৫-বছর পার হয়ে গেলেও গহ্বর থেকে তাকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই জটিল পঙ্কিল অবস্থায় এনে ফেলেছে কারা? জাতির পক্ষে উচিত হবে খুঁজে বার করা তাঁদের।

আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের রয়েছে বিস্তর কয়লার উৎস। এমনকি স্বাধীনতার পরে সিংগ্রাওলীতে (Singrauli) বেশ বৃহৎ আকারের কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আবিষ্কারের কাজে যুক্ত থাকাতে গর্ববোধ কয়া যাচ্ছে। এতে যত কয়লা আছে তা দিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রতিবছর ২,৫০০,০০০ ব্যারেলের মত Synthetic pet-roleum তৈরী হতে পারে—যদি না এই কয়লা অন্য কাজে লাগান হয়। কোরবাতেও (Korba) ঠিক একই ধরণের একটা সংস্থা চলতে পারে। বিহারও আর একটি কারখানা বানাতে পারে। ফুয়েল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট (Fuel Research Institute) একাজে অকেজো কয়লাকে ব্যবহার করার পদ্ধতি তৈরী করেছে। আসামের কয়লাতে খুব বেশী গন্ধক বর্তমান থাকায় পারিবারিক ব্যবহারের কাজে অথবা বয়লারের (Boiler) কাজে সাধারণতঃ এই কয়লা ব্যবহার হয় না। Sulpher (গন্ধক) ও Oxygen মিলে যে Sulpher Dioxide তৈরী হয়, তা শুধু ঝাঝাঁলো গন্ধযুক্তই নয়—এতে ক্ষতি সাধিত হয় ফুস্‌ফুসের (Lungs) ও বয়লারের। তাহোলে কেনই বা আসামের কয়লা তেল তৈরীতে ব্যবহৃত হবে না? আর সে কয়লা থেকে By-product বা উপজাতবস্তু হিসেবে গন্ধক (Sulphur) বের করে নেওয়া হবে নাই বা কেন? এই সালফার একটি খুবই প্রয়োজনীয় মুল্যবান খনিজ পদার্থ। এই পদার্থ আমরা

বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকি—আর তাকেই আমরা বলতে গেলে বিনা খরচে পেয়ে যাব। প্রয়োজন বোধে অন্য স্থানেও একটা দু'টা কারখানা বানাতে পারতাম। এগুলো থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় সব তরল জ্বালানী পাওয়া যাবে, যতদিন না আমাদের জ্ঞান লাভ হবে কি করে একে বাদ দিয়ে চলতে পারি। এর প্রত্যেকটি সংস্থাতে, সোজাসুজি বা পরোক্ষভাবে, ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ লোকের কাজের ব্যবস্থা হবে। তা সত্ত্বেও আমরা অপরিশোধিত তেল আনাতে এখনও অগ্রাধিকার দিয়ে আমদানি করে পরিশোধন করে চলেছি। একে সার্থক অর্থনীতি বলা চলে না। মনে হয় আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই জানেন যে এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেসিয়াকে এক-ঘরে করে, তাদের দেশে তেল রপ্তানি নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাঁরা এখন স্বনির্ভরশীলভাবে Synthetic petrol ও অন্যান্য By-products বানিয়ে চলেছেন। এরা উভয়ে যদি পারেন, তাহোলে আমরাই বা পারবো না কেন? তরল জ্বালানির ভবিষ্যৎ ভেবে, এমনকি U. S. A. পর্যন্ত চিন্তিত। বস্তুত, কিভাবে পরিমিত পড়তায় সিন্‌থেটিক্ জ্বালানী তৈরী সম্ভব হতে পারে, সে বিষয়ে গবেষণা চালান হচ্ছে। আমেরিকার পক্ষে ব্যয়সাধ্য পড়তার অর্থ হোলো মধ্য-পূর্ব দেশ, উত্তর আলাস্কা অথবা নিজ দেশের কাছাকাছি সমুদ্রের তলদেশ থেকে স্বাভাবিক উপায়ে প্রাপ্ত জ্বালানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পড়তা। আর আমাদের হোলো Controlled Economy—নিয়ন্ত্রিত মিতব্যয়িতা। আজকাল বাজারে যে প্রকৃতির তরল জ্বালানিবস্তু চালান হয়ে থাকে তার মূল্যের নব্বই শতাংশ হোলো শুল্কের ভাগ। প্রতি লিটার পেট্রোলের কোম্পানীর দাম দশ পয়সার মত—আর গাড়ীর মালিকদের গুণে দিতে হয় এক টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা (টাঃ ১.৬৫) পর্যন্ত। এই মূল্য হোলো পৃথিবীতে সবচেয়ে উচ্চমূল্য। সিন্‌থেটিক্ পেট্রোলের ওপর দেয় শুল্ক যদি লিটার প্রতি একটাকা পঁয়ত্রিশ পয়সার (টাঃ ১'৩৫) বেশী থেকে কমবেশী একটাকা পঁচিশ পয়সাতে (টাঃ ১'২৫) কমানো হোতো, তবে কি সরকার দেউলিয়া হয়ে যেতো? তেলের আমদানি বন্ধ করে দিয়ে যদি আমরা নিজেরাই তৈরী করি, তাহোলে আমরা সত্যি সত্যি একটা কল্যাণ-

ব্রতী রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাবো—এগিয়ে যাবো গরীবী হটাও পথের দিকে।

খনিজদ্রব্যের অপব্যবহারের কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। আজকাল যেসব কাজে Portland cement ব্যবহার হয় তার সবটাতেই কি এর ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন? সাজাহানের সময়কার তাজ, দিল্লি আগ্রা দুর্গ বা পার্ল (Pearl) মসজিদের কোনোটাতেই সিমেণ্ট ব্যবহার হয়নি। সেগুলোতো এখনো রয়েছে। কিন্তু সিমেন্ট ব্যবহার করে যে বাখরা (Bakhra) বাঁধ তৈরী হয়েছে, তাতে কিন্তু ফাটল দেখা দিয়েছে। তাহোলে মোগলগণ যেসব পদার্থ জমাট গাঁথুনীর কাজে ব্যবহার করতেন, আমরা কি তা ব্যবহার করতে পারতাম না? Lime stone বা চুনাপাথরের জমানো ভাণ্ডার বা সঞ্চয়তো আর অক্ষয় নয়। শীঘ্রই কোনোদিন সিমেণ্টের প্রয়োজনে আর চুনাপাথর মিলবে না—মিলবে না চুনাপাথর লৌহ-ইস্পাত কারখানার কাজের প্রয়োজনে। দেরাদুন (Dehradun) থেকে প্রাপ্ত এবং রাসায়নিক বিচারে প্রায় খাঁটি চুনাপাথর কি চিনির কারখানায় অথবা ঘরের চুনকামের জন্য ব্যবহার করতেই হবে আমাদের? টাল্‌কাম্‌ পাউডার (Talcum powder) কি আমাদের ব্যবহার করতেই হবে? টাল্‌কাম্‌ পাউডার বস্তুটা কি? গন্ধযুক্ত এক প্রকার মাটি বিশেষ, যাকে বলা হয় টাল্‌ক্‌ (Talc), মিহি টাল্‌কাম্‌ কি বস্ত্র তৈরী ও কাগজ তৈরীর কাজে মসৃণতা আনার জন্য, এমন কি রাবার তৈরীর কাজেও অপরিহার্য? টুথ পেস্ট (Tooth Paste) রাখার জন্য টিপলে চিপসে যায় এমন collapsible tube তৈরী করতে এবং পরে ফেলে দেওয়া হয় এমন কৌটা বা টিউব তৈরী করার জন্য কি মূল্যবান ধাতু ব্যবহার করতেই হবে?

মস্তবড় বাঁধগুলো হোলো কিছুটা সামান্য অন্যধরণের ব্যাপার। এগুলো যেন আমাদের নিবু‌র্দ্ধিতার কীর্তিস্তম্ভ। গত পঁচিশ বছরে আমরা মাটি, কাদা, পলিমাটি, বালি, পাথরের চাঙ্গড় জমা করে রাখার জন্য ব্যয়সাধ্য ভাণ্ডার তৈরী করে রেখেছি। আক্ষরিক ভাষায় বলতে গেলে, আমরা এসবেতে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছি। পণ্ডিত নেহরুর ভাষায়—আমাদের নবীন তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু যেসব ইঞ্জিনিয়র এগুলো তৈরী

করেছেন তাঁরা আদৌ চিন্তা করেননি যে কতটা পলি জমতে পারে, অথবা সে সমস্যার কথাই তাঁদের জানা ছিল না। তাঁরা এবিষয়ে মনোনিবেশ করেননি, যেহেতু তারা মনে করেছিলেন যে তাহোলে বহু বছর কেটে যেতো অনুসন্ধানের কাজে। তাহোলে তাঁদের দ্বারা তৈরী না হয়ে, বাঁধ তৈরী হোতো আগামী যুগের লোকের হাত দিয়ে।

এখনই বাঁধগুলো অর্ধেক বা তারও বেশী ভর্তি হয়ে গেছে পলিমাটিতে। যতটা জল ধারণ করার জন্য তৈরী হয়েছিল তার অর্ধেকও ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আজকের পাওয়ার ঘাটতির কারণ হিসেবে এটা হোলো বিশেষ ও প্রধান হেতু। তবু ইঞ্জিনিয়ারগণ এ কথা মুখেও আনছেন না। যদি এর অর্ধেক বা এক-দশমাংশও খরচ করা হোতো গবেষণার খাতে, তাহোলে হয়তো কিছু পাওয়ারের চেহারা দেখতে পেতাম যা দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব হোতো। এখনকার তৈরী বাঁধগুলো দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব হবে না, যদি না বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় বারে বারে বরাবর পলি সরাবার কাজে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারগণ চিন্তা করতেও শুরু করেন নি, কিভাবে পলি সরাবার কাজে হাত লাগাতে হবে। যদি এখনই এই কাজে হাত লাগানো না হয়, তবে জলাধারগুলো ধানের চাষের ক্ষেত হিসেবেই ব্যবহার করা যাবে—এমনকি মাছ চাষ করার কাজেও লাগান যাবে না।

এতে অপারগ হয়ে, অথবা সবটা সম্বল খরচ করার পরে, এখন তাঁরা 'গঙ্গা-কাবেরী যোগসূত্রের' কথা বলে চলেছেন। এটা যেন একটি জাতীয় জলাধার। উদ্ভাবনীর পরম পরাকাষ্ঠাই বটে।

যতটা জানা আছে, পৃথিবীর কোন দেশই এ বিষয়ে চিন্তা করেনি। একদিন সম্ভাব্য সবরকমের ধাতু খরচ হয়ে খতম হয়ে যাবে। এতদিন সে বিষয়ে চিন্তা করে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ। বস্তুতঃ সে দিন আর বেশীদূরে নয়। এণ্টারটিকা (Antartica) হয়তো আমাদের কিছু ধাতুর জোগান দিতে সক্ষম হবে। তাহোলেও আমাদের শিখতে হবে কি করে সেখানকার খনি খনন করতে হবে। তাতে হয়তো কয়েক দশক কেটে যাবে। প্রচুর আগ্রহী ক্রেতার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। বেপরোয়া প্রতিযোগিতার টানে মূল্য গিয়ে উঠবে একেবারে তুঙ্গে—পরিস্থিতি গিয়ে দাঁড়াবে বিক্রেতাদের স্বর্গধামে। ইউরোপ,

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া অথবা ভারতের চেয়ে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ভাণ্ডার হয়তো কিছুদিন বেশী দিন স্থায়ী থাকবে। কিন্তু তাও বেশী দিন স্থায়ী হবে না। তাহোলে তারপরে আমরা কি করবো?

যদি আমাদের সিন্‌থেটিক্ প্রসেস ধরে চলতে হয় তাহোলে পরিত্যক্ত উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ অথবা বনের কাঠ থেকেই প্রস্তুতের প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা দরকার। তাহোলে যে বৃক্ষ দু'এক বছরের মধ্যে পরিণত অবস্থায় আনা যায় সে জাতীয় বৃক্ষ জন্মানোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমরা পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করতে পারি না, বন থেকে গাছ কেটে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। তাহোলেও এ ব্যাপারে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট জমিই বা পাওয়া যাবে কোথায়? আগামী দিনে খাদ্য ঘাটতির কথা সবার মুখে মুখে। আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পথ জেনে নিতে পারি —যাতে খাদ্য সংকটের আঁচ না লাগে আমাদের গায়ে। কিন্তু ধাতু অথবা খনিজ পদার্থের সংকটের কথা—এমন কি সামনের ধাতুবিবর্জিত বছরগুলোর কথাও বলেন না কেউ। 'NCST' কি এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন? কোন পরিকল্পনা আছে কি তাদের?

DON'T EXPORT MINERALS, DON'T IMPORT OIL—রপ্তানি করোনা আকরিক পদার্থ, করোনা আমদানি তেল। এটাই হওয়া উচিত আমাদের সোচ্চার নৈতিক ধ্বনি বা শ্লোগান। ইতিমধ্যে নির্দেশ প্রদানের জন্য এক কমিশন বসানো হোক, যে কমিশন নির্দিষ্ট করে দেবে কোন্ ধাতু কোন্ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে, এবং শুধু নির্দেশিত বিশিষ্ট প্রয়োজনেই ব্যবহার করা চলবে। আজকালকার টাল্‌কাম্ পাউডার অথবা টুথ পেস্টকে বাদ দিয়েই চলতে হবে। তাহোলে সেটা হবে সুযোগ্য ত্যাগের পরম উৎকর্ষ। প্রস্তুতকারীদের মর্জির ওপর নির্ভর করে আপন খুশিমাফিক যাকে-তাকে মিনারেল বিক্রি করার এক তরফা অধিকার ছেড়ে দেওয়া যাবে না। দেওয়া হবে না আপন খুশিতে অর্থ রোজগার করে ধনকুবের বনে যাবার স্বাধীনতা। আজকের মুনাফা শিকারের তাগিদে আমাদের ভবিষ্যতের সঞ্চয়কে বিনষ্ট করার অধিকার দেওয়া হবে না।

শেষ পরিণতির ভবিষ্যদ্বক্তা আমি নই। আনি মেনে নিচ্ছি, কারিগরী

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অপরিকল্পনীয় বিকাশ হতে চলেছে। কিন্তু ভুললে চলবে না, মানুষ খুবই অহমিকাপ্রবণ এবং নিজের ব্যর্থতার কথা অল্পেতেই নীরবে ভুলে যায়। এনন কি কোলারের খনি থেকে সোনা তুলে আনার কাজও কি ফেলে রাখতে হয়নি আমাদের? তার কারণ হলো, মানুষের উদ্ভাবনীজ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয়নি খনির ভেতরের পাথর ভেঙ্গে-পড়া রোধ করা—সম্ভব হয়নি উত্তাপের সঙ্কটকে আয়ত্তে আনা। তাই পঞ্চাশ বছর চেষ্টা করার পরেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে খনির কাজ। আরো নিম্নমানের ধাতু হলে হয়তো আরো অনেক আগেই ছেড়ে দেওয়া হোতো। কিন্তু ধাতুর বিকল্প বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। ২০,০০০ বছর লেগেছিল মানবজাতিকে প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান সভ্যযুগে আসতে। সামনের এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে এই সভ্যযুগের ঘড়ির কাঁটা উল্টোমুখে চলতে শুরু করে আবার প্রস্তর যুগের দিকে চলতে যাচ্ছে। আইনস্টাইনকে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তৃতীয় মহাযুদ্ধে কী ধরণের অস্ত্র ব্যবহার হবে? আইনস্টাইন বলেছিলেন : তিনি জানেন না তৃতীয় যুদ্ধের অস্ত্রের কথা, তবে চতুর্থ যুদ্ধ চালানো হবে প্রস্তর দিয়ে। এটা কি ভবিষ্যৎ বাণী? না, এটা কোনো সরল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত!

যদু বংশ ?

আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মানুষের বা সভ্যতার চেহারা বা অবস্থাটা কী দাঁড়াবে বা দাঁড়াতে পারে এ সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আমাদের আছে কি? দিনরাত মানুষ খাটছে, খাচ্ছে, মরছে, মারছে—দিনগত পাপক্ষয়ে ব্যস্ত আছে। জীবিকার সন্ধানে মানুষ নিরন্তর ব্যস্ত। এর মধ্যে দেশ সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও নানা ধরণের রাজনীতি, সমাজনীতি, বৈদেশিকনীতি দেশে দেশে নিরন্তর তাপ সৃষ্টি করে চলেছে। পিছিয়ে পড়া দেশসমূহের অগণিত জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা-চরিত্র চলছে। তথাপি আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি কোথায়, এবং কোথায় যেতে চাই এবং সেখানে পৌছনো সম্ভব হবে কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। মানুষের সভ্যতা অবশ্যম্ভাবীরূপে উন্নতির পথেই নির্ধারিত, ইতিহাসের এই একটি মাত্র মঙ্গলজনক অবধারিত ভবিষ্যতই আছে—হয়তো এমন ধরণের স্বতঃসিদ্ধ নিয়তি নেই। প্রশ্ন উঠেছে আমরা কি শেষপর্যন্ত এক মহতীবিনষ্টির দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি না?

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই জাতীয় নৈরাশ্যবাদী সন্দেহের অবকাশ বা প্রয়োজন হঠাৎ এলো কেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর মানুষ বহু সংকট বহু ধ্বংসকাণ্ডের মধ্য থেকেও পার হয়ে যদি এতদিন বেঁচে থাকতে পারে এবং বর্তমানে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান এতটা বেড়ে গিয়ে থাকে, যা কোন কালে ছিল না, তবে এখনই এ প্রশ্নের অবতারণা কেন?

ভারতের আদমসুমারী বিভাগের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল ডঃ বিক্রম রায়বর্মণ সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশানল সেণ্টারের কৌন্সিল ফর কালচারেল স্টাডিস নামক প্রতিষ্ঠান থেকে Towards 2000 A. D. নামে একটা পেপার বুদ্ধিজীবীদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। বর্তমান

সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি, তার অন্ধকার দিক ও আলোর দিক, উভয়দিক থেকেই বর্তমান জগতের পণ্ডিতেরা কে কি বলছেন, তার সংক্ষিপ্তসার একত্র করে উপস্থিত করে ধরেছেন। নৈরাশ্যবাদী ও আশাবাদী উভয় পক্ষেরই অনেক বক্তব্য আছে। উভয় পক্ষের যুক্তিজাল বিচার করার পরেও ডঃ রায় বর্মণ মানুষের সম্মুখে যদুবংশের অনিবার্য ধ্বংসের অবধারিত নিয়তি দেখতে পান নি। ডঃ রায়বর্মণের সমীক্ষার বিচার বিশ্লেষণ একটি ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। আমরা তা করতে যাবও না। আমরা এই প্রবন্ধ নিয়ে একটা 'নিষিদ্ধ বিষয়ের' উপরে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। 'নিষিদ্ধ বিষয়' এই জন্যই বলছি যে আমাদের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। কোন্ দৃঢ়প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে কবি এতবড় শাসন দিয়েছিলেন জানি না। রবীন্দ্রনাথ অনেককিছু দেখে যাননি। পৃথিবীর মানুষ এখন সশরীরে চন্দ্রলোকে পদচারণ করে, মঙ্গলগ্রহে পদপাত করারও চেষ্টা করছে, এসব দেখে যেতে পারেন নি বলে তাঁকে ভাগ্যহীন বলবো না। ভাগ্যবান বলবো এই জন্যে যে তিনি জেনে যেতে পারেন নি, মানুষ কতো বর্বর হতে পারে, দেশ বিভাগ করার সময়, শুনে যেতে পারেন নি পৃথিবীকে কেবল নিঃক্ষত্রিয় নয় নির্জীবন করে দেবার মত ক্ষমতা। পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে একটা অঙ্গারে পরিণত করে দেবার মত পারমাণবিক বোমা ও অস্ত্রশস্ত্রের এত আবিষ্কার হয়েছে যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ জীবশূন্য করে দেওয়া সম্ভব। তিনি দেখে যাননি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের কী হাল হয়েছে, যেখানে টাকা দিয়ে সবকিছু কেনাবেচা যায়। আদর্শবাদ বা ইডিওলজিগুলির অন্তঃসারশূন্যতাও তাঁকে দেখে যেতে হয়নি। দুনিয়ার সর্বহারা মানুষেরা এক হোক, দুনিয়ার কৃষক ও শ্রমিকেরা এক হোক—সেই আন্তর্জাতীয়তাবাদী মার্ক্সবাদী আদর্শানুসরণকারীরাও শেষ পর্যন্ত সীমান্ত বরাবর কীভাবে মারণাস্ত্র নিয়ে সৈন্য-সামন্ত দাঁড় করিয়ে বিনিদ্র রজনী অতন্দ্র পাহারায় নিযুক্ত এ দৃশ্যও তিনি দেখে যাননি।

তথাকথিত উন্নত অগ্রসর দেশগুলির আভ্যন্তরীণ সভ্যতার সংকট কী-ভাবে ও কতভাবে উৎকট হয়ে উঠেছে। বস্তুবহুল ভোগসর্বস্ব আমেরিকান সভ্যতার মধ্যেই নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—হিপ্পি যার একটা

উৎকট প্রতিবাদ। অথচ এই বস্তুবহুল ভোগসর্বস্ব সভ্যতাই সকল অনুন্নত সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনা। এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার লোকেরাই জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোক আজও দারিদ্রসীমার নীচে পড়ে আছে। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির জীবনমানের ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। স্বাধীনতার পরেও এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির বেশীর ভাগই এই প্রতিযোগিতায কেবলই হেরে যাচ্ছে—এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ক্রমশ পরাধীনই হয়ে চলেছে। এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া দেশের মুষ্টিমেয় লোক ইযোরোপ আমেরিকার ভোগবহুল জীবনের স্বাদ ও সাধ নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য জনসাধারণকে নির্লজ্জ-রূপে শোষণ ও বঞ্চিত করে চলেছে। জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধ নিযন্ত্রিত হচ্ছে আমেরিকান ভোগ্যমান দিয়ে—সে সদ্যস্বাধীন দেশই হোক আর সমাজতান্ত্রিক দেশই হোক।

আমাদের মত দরিদ্রদেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদেরাও এই ধরণের উন্নতির স্বপ্ন দেখাতে কখনও বিরত হন না। তারাও মনে করেন অথবা জনসাধারণকে লোভ দেখান এই বলে যে ইয়োরোপ আমেরিকাতে যে ধরণের জীবনমান ও ভোগবিলাস সম্ভব হযেছে সেই ধরণের ভোগবহুল জীবন আমাদের আয়াসসাধ্য। তারা কোন্ হিসেব অনুযায়ী এ ধরণের আশ্বাস দিয়ে থাকেন জানি না, হয়তো নিজেদের অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের জীবনের সাফাই করবার জন্যই এ জাতীয় প্রতারণা করে থাকেন।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি, সমাজতত্ত্ববিদেরা রোমের 'একাডেমি-সিযা-ডেই-লিনসেই'-এ মিলিত হযে এক সমীক্ষা চালান। "ক্লাব অব রোম" নামে তা' খ্যাতি লাভ করে। ১৯৩০ সালে "লিমিট্স অব গ্রোথ" নামে তাদের সমীক্ষা প্রকাশ করেন। মানুষের জীবনমানের উন্নত্তির একটা সুস্পষ্ট সীমা বলে তারা দেখিয়ে দেন। এই সীমা-সমীক্ষা করতে গিয়ে তারা প্রধানত পাঁচটি বিষয়ের বিচার করেন। জনসংখ্যা, কৃষির সম্ভাব্য উৎপাদন, প্রাকৃতিক সম্পদ বা রিসোর্স, শিল্পোৎপাদনের সীমা ও আবর্জনাজনিত দূষিতকরণ বা পলিউশান-এ পাঁচটি বিষয়ের বিচার করে

দেখান যে মানুষের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়, আগামী একশ বছরের মধ্যেই মানুষ এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

তারা দেখান যে ১৯৩০ সালের পৃথিবীর জনসংখ্যা ৩০০ কোটি থেকে ২০০০ সালে দাঁড়াবে ৬৫০ কোটিতে। যে হারে মনুষ্যসংখ্যা বাড়ছে, যে হারে শিল্পোত্তম বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়া ও পরিবেশ যেভাবে দূষিত হচ্ছে, যে হারে পৃথিবীর মূল সম্পদ উড়িয়ে পুড়িয়ে ক্ষয় করে দেওয়া হচ্ছে, তাতে আগামী একশ বছর পরে আর কোন উন্নতির পথ খোলা থাকতে পারে না। পৃথিবীর মোট চাষযোগ্য জমি ৩·২ বিলিয়ান হেক্টর। বর্তমান উৎপাদনের হারে প্রয়োজন হয় মাথাপিছু ০.৪ হেক্টরের। ১৯৩০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা যদি দ্বিগুণের বেশী হয়, তবে সেই বিপুল জনসংখ্যাকে খাওয়াতে পরাতে গেলে চাষের উৎপাদনের হার কতগুণ বাড়াতে হবে, এবং তা বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় সার, জল, বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতি পাওয়া সম্ভব হবে কি? রাসায়নিক সারের ব্যবহার গত-যুদ্ধের পর থেকে পাঁচগুণ ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে, আর কতগুণ বাড়ানো চলবে? এখনই পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোক খাদ্য ও পুষ্টি যোগাতে পারেনা।

কয়লা, তেল বা পেট্রোল ইত্যাদির উৎস অন্তহীন নয়। সম্প্রতি বিলেতের অস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জে. এ. রোপ ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবীর তেল বা পেট্রোল ফুরিয়ে এলো বলে। আগামী ৬০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে এই তেলহীন পৃথিবীর সংকট অনিবার্য। বর্তমানে যেখানে যত তেল আছে বলে জানা আছে, এবং যে হারে তেল খরচ হচ্ছে, সেই তেল যদি আরও পাঁচগুণ বেশী আবিষ্কৃত হয় তবে চলবে মাত্র ৩১ বছর। তেলের খরচ বছর বছর পাঁচ শতাংশ বেড়ে চলেছে। যদি ধরে নেওয়া হয় ১০ গুণ অধিক তেলও আছে তা হলেও ৫০ বছরের বেশী চলবে না। যদি ২০ গুণ বেশী আছে বলেও ধরা হয় তা হলেও ৭৮ বছরের বেশী চলবে না। ইতিমধ্যে "উন্নতি"র হার আরও বাড়বে এবং যত বাড়বে তত তাড়াতাড়ি তেল ফুরিয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, এই তেল দিয়ে কেবল মোটর গাড়ী আর ডিজেল ইঞ্জিনই চলে না বা এরোপ্লেনই চলে শুধু নয়; রাসায়নিক সার ও পেট্রোকেমিকেলের মূল উপাদানও এই তেল। এই তেলহীন পৃথিবীর এনার্জীর উৎস তখন কী দিয়ে চলবে?

তেল-নির্ভর শিল্পবাণিজ্য যানবাহন বিমান ইত্যাদির উপর নির্ভর সভ্যতার কাঠামো তখন হঠাৎ ধপ্ করে বন্ধ হয়ে যাবে না কি? ইতিমধ্যে আমেরিকার তেল ফুরিয়ে এসেছে বলে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, মধ্য এশিয়ার (সৌদিআরব, ইরাক, ইরান, কোয়াইত ইত্যাদি মুল্লুকের) তেলের উপরে তাই ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশের ও রাশিয়ার ও চীনের এত নজর। টয়েনবিতো মনে করেন পৃথিবীর তৃতীয় মহাযুদ্ধ এই মধ্য এশিয়ার তেল নিয়েই হবে, হয়তো সেটাই শেষ যুদ্ধ হবে —কেননা সেই যুদ্ধে পৃথিবীব যাবতীয় মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হবে—এবং তখন পৃথিবীর যদুবংশের ধ্বংস হবে। যে তেল কয়লা লোহা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ ও ধাতুগুলি পৃথিবীর গর্ভে সঞ্চিত হয়েছিল, এগুলি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে, তার নতুন করে সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। গত পাঁচ হাজার বছরে এসব অমূল্য সম্পদের যতটুকু ব্যবহার হয়েছে তার ১০০ গুণ ব্যবহৃত হয়ে গেছে গত একটি জেনারেশনেই। কী হারে এবং কত অথহীনভাবে আমরা এসব উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখাব করে দিচ্ছি তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ইতিমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ, গৃহযুদ্ধ, দেশে দেশে যুদ্ধপ্রস্তুতি, সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ ইত্যাদির ইন্ধন যে কিছু কমছে তা মনে করার কারণ নেই। আসন্ন সামূহিক সর্বনাশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোথাও কোন সত্যিকার চেতনা আছে বলে মনে হয় না। ষড়রিপু-বর্ধক সভ্যতার স্বর্ণমৃগের পিছনে আমরা সবাই অন্ধের মত ছুটেছি। পরিণাম সম্বন্ধে কেউ এতটুকু সচেতন বলে মনে হয় না। ন্যায় নীতি সভ্যতা শালীনতাবোধ ও সংযম প্রভৃতির কথা অপাংক্তেয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের পণ্ডিতগোষ্ঠীরা অবশ্য মানুষের সভ্যতার এই অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'ক্লাব অব রোমের' মত পোষণ করেন না। তাঁরাও জটিল যুক্তিজালে এই হতাশাবাদের খণ্ডন করে চলেছেন। মানুষের চেষ্টার ও মহত্বের মহিমা তাঁরা দেখিয়েছেন। তাছাড়া পৃথিবীর এনার্জীর সোর্স কয়লা বা তেলের উপরেই চিরকাল নির্ভরশীল থাকার কথা নয়। সোজাসুজি সূর্যকিরণ থেকে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার গতিবেগ থেকে, পারমাণবিক শক্তি থেকে মানুষের হাতে অফুরন্ত শক্তির উৎস দেখতে পান। সোজাসুজি বৃক্ষ ও ওষধি থেকে মানুষের ভোগ্য প্রোটিন

তৈরী করার পথ আবিষ্কারের কথা বলেন। সমুদ্র মন্থন করেও বিপুল ভোগ্য পদার্থ পাবার কথা বলেন, স্টীম চালিত মোটর গাড়ীর কথাও বলেন। আরও কত কি সম্ভাবনার কথা বলা চলে। যুগে যুগে মানুষ নানা সংকট থেকে পার হয়ে এসেছে। যতবড় চ্যালেঞ্জ ততবড় উত্তর বা রেস্‌পন্‌সের কথা টয়েনবি ইতিহাস ঘেঁটে দেখিয়েছেন।

কিন্তু এজাতীয় response বা resurrection of human will যদি সত্যিই আসে তবে নিশ্চয়ই মানুষ এই মহতীবিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবে। ডঃ রায়বর্মণ মানুষের ঘোর দুর্দিনে সেই চৈতন্য মানুষের আসবে বা আসছে বলে মনে করেন। Magnificient response of human wisdom and human will তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু কোথায়, কোন দেশে ? 'তরুণের বিদ্রোহ' তিনি নানা দেশে দেখিয়েছেন। কি এই বিদ্রোহ ? এর নুইসেন্স মূল্য ছাড়া আজও তার সত্যিকার মূল্য কতটুকু আছে ? এই বিদ্রোহী (?) তরুণেরা কতটুকু বিদ্রোহী ? তাদের সত্যিকার বিকল্প মত বা পথটা কি ? তারা কি সত্যিই বিপ্লবী এবং কতটুকু সে বিপ্লব ? একটা নুইসেন্স ভেল্যু ছাড়া অন্যকোন মূল্যবোধ তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নি বলে তাঁরা কি ইতিমধ্যেই দেশে দেশে তলিয়ে যাননি ? আর বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহ বা বইপত্র ? সেগুলি কে পড়ে, কারা মূল্য দেয় ? ক'জনা জানে, ক'জনা ভাবে ? বৈজ্ঞানিক গবেষণার গঠনমুলক আবিষ্কারের ফলিত ব্যবহার কোথায় ও কতটুকু ?

ডঃ রায়বর্মণ Jouvenal-এর এক উদ্ধৃতি নিয়ে তাঁর আশাবাদকে সমর্থন করেছেন, "আমাদের ভাগ্যে কি আছে তা নির্ভর করবে আমাদের পথ বেছে নেবার উপরে। যেহেতু এই পথ বেছে নেবার উপরে সব কিছু নির্ভর করছে, সেহেতু অবস্থাটা আজ সত্যিই কি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও তার তাৎপর্যের যথাযথ মূল্যায়ন করা তাই এত প্রয়োজনীয়।" ডঃ রায়বর্মণ হয়তো মনে করেছেন যে আমরা তা করছি বা করতে ব্যস্ত ! পূজোর মণ্ডপে হাড়িকাঠের কাছে বাঁধা বধ্য কপালে সিন্দুরচিহ্নিত ছাগ-শিশুর মত আমরা কি এখনও নিশ্চিন্ত মনে প্রফুল্লচিত্তে ঘাস চিবুতেই ব্যস্ত নই ?

১৫-৯-৭৩

নতুন ধরণের জীবনের জন্য লড়াই

অজিতনারায়ণ বসু

কয়েকদিন আগে আমাদের এক বন্ধু ভিয়েৎনাম থেকে ফিরেছেন। তিনি সেখানে প্রায় মাস ছয়েক ছিলেন। তিনি গল্প করছিলেন যে ওখানে প্রথম গিয়ে সবচেয়ে আগে নজরে আসে যে প্রত্যেকেরই জীবন-যাত্রার মান মোটামুটি একরকম। উদাহরণ স্বরূপ বলছিলেন যে শীতের দেশ উত্তর ভিয়েৎনামেও প্রত্যেকটি মানুষ বছরে ৫ মিটার করে কাপড় পায়। এই ঘটনার বৈশিষ্ট্য দুটি ঃ ১। যা পায় তা প্রত্যেকেই পায়; ২। প্রত্যেকে ৫ মিটার করে পায়।

আজকের এ প্রবন্ধ কিন্তু ভিয়েৎনাম নিয়ে নয়। এ প্রবন্ধ আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে। ভিয়েৎনামের উল্লেখ একটা পশ্চাৎপটের জন্য, যার সামনে দাঁড করালে আমাদের নিজেদের দেশের অবস্থাকে আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যাবে।

যদি সব মানুষের গড় ধরা যায়, তাহলে আমাদের দেশে যা কাপড় উৎপাদন হয়, তাতে প্রত্যেক মানুষকে এর প্রায় তিনগুণ পরিমাণ কাপড় দেয়া যায়—১৫ মিটার। কিন্তু প্রত্যেকেই কি এই একই পরিমাণ কাপড় পায়? নিশ্চয়ই না। প্রত্যেকেই কি, এমন কি ভিয়েৎনামের লোকদের মত ৫ মিটার করেও কাপড় পায়? নিশ্চয়ই না। বড় লোকদের কথা ছেড়েই দিলাম; মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও বছরে অন্ততঃ ১০ খানা কাপড়—এবং তার সঙ্গের আনুষঙ্গিক—কেনে। ১০ খানা কাপড় এবং তার আনুষঙ্গিক মিলিয়ে হবে অন্ততঃ ৭৫ মিটার। এই রকম ১ জন মেয়ে যদি ৭৫ মিটার কাপড় কেনে এবং ৪ জন মেয়ে যদি কোন কাপড় না কেনে, তবে ঐ ১+৪ বা ৫ জন মেয়ে মিলে পেল ৭৫ মিটার অর্থাৎ

মেয়ে পিছু গড় হল ৭৫÷৫=১৫ মিটার! এই হচ্ছে আমাদের দেশের গড়। এই গড়ের পিছনে আছে কয়েক জনের নিত্য নতুন শাড়ি পরা—আর তার অনেক গুণ বেশী মেয়ের কিছু না পরতে পাওয়া। অথবা খুব কম পরতে পাওয়া।

গ্রামে গরীব কৃষকের বাড়িতে একটু তাকিয়ে দেখবার সাহস হলে, এই সত্যটা চাবুকের মত এসে আমাদের মাথায় লাগবে। খুব কম বাড়িতেই মা এবং বড় মেয়ে একসঙ্গে বাইরের মানুষের সামনে আসতে পারে। ছেঁড়া যে কাপড়খানা আছে, তাও ভাগ করে পরতে হয়। মা পরলে, মেয়ে পরতে পারে না। আবার মেয়ে পরলে, মা পরতে পারে না।

কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরেও মা এবং মেয়ে—দুজনেই ইচ্ছা করলে একসঙ্গে অনেকগুলো আস্ত কাপড় পরতে পারবে।

গরীব কৃষকের ঘরের পুরুষ মানুষ পরবে গামছা। আর সহরের এমন কি মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষেরাও পরবে বেশ কয়েকটা গরম কিংবা টেরিলিন কিম্বা সুতীর প্যাণ্ট-সার্ট-চাদর ইত্যাদি। এদের সকলের গড় নিলেও দাঁড়াবে ঐ ১৫ মিটার বা তার কাছাকাছি।

আমাদের দেশেও গড়ে এক এক জনে ১৫ মিটার করে পায়। কিন্তু এই ১৫ মিটার প্রত্যেকে পায় না। ভিয়েৎনামের মানুষেরা যা পায় তা সবাই পায়। আমাদের দেশেও এটা করা সম্ভব। এক্ষুণি এটা করা সম্ভব। তবে এটা বাস্তবে হচ্ছে না কেন? হচ্ছে না তার কারণ—

*এটা হলে যাদের লাভ, দেশের গরীব ঐ শতকরা ৭৫ ভাগ লোকের কোনো সংগঠন নেই। তাই তাদের স্বার্থে কোনো কাজ হওয়া খুবই কষ্টকর—প্রায় অসম্ভব। এখনও।

*এটা হলে যাদের ক্ষতি, দেশের বড়লোক ঐ শতকরা ১ ভাগ (বা তারও কম) লোকদের নিজেদের খুব জোরদার সংগঠন আছে। এবং তাদের স্বার্থটাই দেশের সমস্ত মানুষের স্বার্থ, এই মিথ্যা কথাটা খুব জোর গলায় প্রচার করার মত, সাধারণ মানুষকে বিপথে চালনা করার মত তাদের খুব ভাল ব্যবস্থা আছে। তাই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা খুবই কষ্টকর। এখনও।

*এদের মাঝামাঝি আছে আমাদের মধ্যবিত্তরা। লাখে একজন

লটারির টাকা পাবার মত, লাখে একজন মধ্যবিত্ত হয়ত ঐ উপরের তলায়, ঐ শতকরা ১ ভাগের সমাজের একজন হয়ে উঠতে পারে। বাকিরা দ্রুত ঐ শতকরা ৭৫ ভাগের দিকে এগুচ্ছে। ১৯৩০ সালে গ্রামে কৃষকদের শতকরা ২৮ ভাগ ছিল ভূমিহীন; শতকরা ৭২ ভাগের জমি ছিল। ১৯৩০ সালে কৃষকদের শতকরা ৪৫ ভাগ ভূমিহীন হযে গেল; জমি রইল শতকরা মাত্র ৫৫ ভাগের হাতে। অল্প জমির মালিকেরা হাজারে হাজারে ভূমিহীন হযে গেছে। ২।১ জন বড়লোক হযেছে। কিন্তু লটারির যারা টিকিট কাটে, তাদের প্রত্যেকেই ভাবে সে লটারির টাকাটা পাবে, এইটাই তাদের জীবনের স্বপ্ন, এই স্বপ্নটা ধরেই তারা তাদের জীবন, তাদের চিন্তাধারা চালনা করে। তাই এরা সর্বান্তঃকরণে গরীবের পাশে এসে দাঁড়ায় না—গরীব তার কাছে একটা বিভীষিকা। তারা বড়লোকদের তাঁবেদারি করে। আর, নিজেরা বড়লোক হবার অবাস্তব স্বপ্ন দেখে।

আমাদের দেশের এই শতকরা ২০।২৫ ভাগ মধ্যবিত্ত লোকদের নিযে এই প্রবন্ধ। এই বিত্তটা ৫।১০ একর জমি বা একটা ছোট দোকান বা ৫০০ টাকা মাইনের চাকরি, বা কলেজের একটা ডিগ্রী বা এই জাতীয অন্য কিছু। এরা লটারির টিকিট কেনে। এরা ধার-দেনা করেও ছেলেকে বড় স্কুলে—সম্ভব হলে ইংরেজি স্কুলে পড়ায়। ট্রানজিস্টার কেনে, ঘড়ি কেনে, সহর হলে ইলেকট্রিক ফ্যান কেনে। বছরে ২।৪ খানা দামী শাড়ি, ভাল কাপড় জামা কেনে; বছরে ২।৪ দিন অনেক পয়সা খরচ করে বড় হোটেল-রেস্তোরাতে খায। এদের ২।৪ জন রেফ্রিজারেটার কেনে, টেলিভিসন কেনে। বাকিরা স্বপ্ন দেখে। আগামী বছর কিনবে—কিংবা তার পরের বছর, অবস্থাটা একটু ভাল হোলে। লটারিটা পাওযা গেলে। এই স্বপ্ন।

এই স্বপ্ন থেকে লাভ হয় কার? ক্ষতি হয় কার? লাভ হয় যারা ঐ লটারির ব্যবসা করে তাদের। আর লাখে একজন লোকের। ক্ষতি হয় প্রতি লাখ লোকের মধ্যে ৯৯ হাজার ৯ শত ৯৯ জনের। ক্ষতি হয় সমগ্র দেশের।

লাভ হয় মুষ্টিমেয় যে সব ব্যবসাদার ঐ ভাল শাড়ি, ভাল টেরিলিন,

ট্রানজিস্টার, টেলিভিসন, ফ্যান, রেফ্রিজারেটর, ঘর ঠাণ্ডা রাখার কল, ইত্যাদি তৈরী করে, বিক্রি করে। কেনে শতকরা ১ থেকে ৫ জন লোক। কিনবার স্বপ্ন দেখে শতকরা ২০।২৫ ভাগ লোক। 'জাতে' ওঠবার স্বপ্ন দেখে। ঐসব থাকলেই 'জাতে' ওঠা যায়, এই রকমের একটা মনোভাব সৃষ্টি হয়। এদের শতকরা ১ জনও জাতে ওঠে না। এই স্বপ্ন থেকে এদের শতকরা ১ জনেরও লাভ হয় না। শতকরা ৯৯ জনের ক্ষতি হয়। তবু মধ্যবিত্তরা ঐ স্বপ্ন দেখে। এতে তাদের ক্ষতি হয়। সমগ্র দেশের ক্ষতি হয়। সমগ্র দুনিয়ার ক্ষতি হয়।

নীচের দিকের ৭৫ ভাগ লোকও স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন, দুবেলা পেট ভরে খাবার। কারণ এখন তারা রোজ এক বেলাও পেট ভরে খেতে পায় না। সে স্বপ্ন, বছরে ২ খানা করে মোটা কাপড় শাড়ি জামা কেনবার। কারণ এখন অনেকে ২।৩ বছরেও ১ খানা নতুন কাপড় শাড়ি কিনতে পারে না। সে স্বপ্ন, এক টুকরো নিজের জমি পাবার, যেখানে সে নিজে তার ছেলে বৌকে নিয়ে, নিজের হাল বলদ দিয়ে চাষ করবে। এখন দেনার দায়ে, অজন্মার চাপে, অসুখ-বিসুখের চাপে সামান্য যেটুকুও জমি আছে তা হাত ছাড়া হয়ে যায়। গরু বলদ মরে যায়, কিংবা বিক্রি করে দিতে হয়। সে স্বপ্ন মাথার উপরে খড়ের ছাউনিটা ভাল করে দেবার, যাতে বৃষ্টির জল শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া না ঢুকতে পারে। এখন ছাদের ফুটো, দেয়ালের ফাঁক বছরের পর বছর বাড়তেই থাকে। তারপর কলকাতার ফুটপাথ। এখনও এইটাই অবস্থা।

নীচের দিকের ৭৫ ভাগ লোকের স্বপ্নকে এখনই—নিদেন পক্ষে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে—নিশ্চয়ই সফল করা সম্ভব। এটা করতে পারলে এই গরীবদের উপকার হবে। সমগ্র দেশের উপকার হবে। সমস্ত দুনিয়ার উপকার হবে।

মাঝখানের শতকরা ২০।২৫ ভাগ লোকের স্বপ্নকে, এখন বা ভবিষ্যতে, কখনই সফল করা সম্ভব নয়। এবং এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য মধ্যবিত্তরা যতবেশী মাথা খুঁড়বে, যত বেশী ছট্‌ফট্‌ করবে, তত বেশী করে ক্ষতি হবে ঐ মধ্যবিত্তদের। ক্ষতি হবে সমস্ত দেশের। ক্ষতি হবে সমস্ত দুনিয়ার। কারণ, যতদিন তারা এই অসম্ভব স্বপ্ন দেখবে, ততদিন

তারা ঐ নীচের ৭৫ ভাগ লোকের পিছনে বা তার সঙ্গে দাঁড়াবে না। সব লোককে কি করে দু'বেলা মোটা ভাত রুটি খেতে দেওয়া যায় তার স্বপ্ন না দেখে, সে স্বপ্ন দেখবে লটারির পুরস্কার পাবার, দোতলা পাকা বাড়ি বানাবার, রেফ্রিজারেটর কিনবার, ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে পড়াবার। তার এর কোনটাই বিশেষ হবে না। কিন্তু ঐ ছট্‌ফটানিতে লাভ হবে উপরের দিকের শতকরা ১ জন লোকের। তাদের 'জিনিষ' বিক্রি হবে।

এরা লটারির টিকিটের ব্যবসাদার। এরা ইংরেজি শিক্ষা বিক্রি করার ব্যবসাদার। এরা রেফ্রিজারেটর, টেলিভিসন বিক্রির ব্যবসাদার। এরা বড় হোটেলের ব্যবসাদার। এরা মোটর গাড়ীর ব্যবসাদার।

মধ্যবিত্তরা কি—জেনে হোক কি না জেনে হোক—ঐ ব্যবসাদারদের পিছনে নিজেদের সামিল রাখবে? এদের জিনিষের বিজ্ঞাপন লিখে পয়সা করার স্বপ্ন থেকে কি তারা বেরুবে না? এটাও কি অন্ততঃ তারা দুচোখ খুলে দেখবে না যে ঐ রেফ্রিজারেটর, মোটরগাড়ি—ইংরেজি শিক্ষা বিক্রির ব্যবসাও আর চলছে না? গত ১১ বছরে কলকাতার শিল্পে উৎপাদন বাড়েনি—কমেছে। কলকাতার বন্দরে মাল যাতায়াত বাড়েনি—কমেছে। কলকাতার মানুষের চাকরি, আয় বাড়েনি—কমেছে। ঐ শতকরা ১ জন বড়লোকের দুনিয়াও দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে, তাদের জাহাজ ডুবছে। ডুবন্ত জাহাজের ইঁদুরদের যে কাণ্ডজ্ঞান থাকে, সেটুকু কাণ্ড-জ্ঞানও কি আমাদের মধ্যবিত্তদের হবে না?

রেফ্রিজারেটর বা ঐ জাতীয় জিনিষ তৈরীর কারখানা বা ব্যবসা তখনই ভালভাবে চলতে পারে, যখন বড়লোকের সংখ্যা, ঐ সব জিনিষ কিনবার লোকের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ে। কারণ এ বছর যে বড়লোক রেফ্রিজারেটর বা মোটরগাড়ি বা ইলেকট্রিক পাখা কিনল, সে নিশ্চয়ই পরের ৫।১০ বছরের মধ্যে ওগুলো আর কিনবে না। তা'হলে পরের বছরের উৎপাদন কিনবে কে? তাই বড়লোকেরাই যে সব জিনিষ কেনে সেই জিনিষের ব্যবসা চালু রাখতে গেলে, বাড়াতে গেলে, এ বছরের তুলনায় পরের বছর নতুন বড়লোকদের সংখ্যা বেশী হওয়া দরকার। তার পরের বছর আরও বেশী। যদি কোনো বছর আর না বাড়ে? যদি তারপর নতুন বড়লোক হবার সংখ্যা বছর বছর কমতে থাকে? তবে ঐ কারখানায়,

ব্যবসায় উৎপাদন কমবে, বিক্রি কম হবে। তখন উপায় বিদেশে রপ্তানি। সস্তায়। অনেক ভর্তুকি দিয়ে। ফলটা দাঁড়ায় বিদেশের বাজারের উপর নির্ভর করে শিল্প গড়ে তোলা এবং বিদেশের বাজার বজায় রাখবার জন্য বিদেশে সস্তায় মাল বিক্রি করা—আর মালিকদের মুনাফা ঠিক রাখার জন্য দেশের মধ্যে সব জিনিষের দাম বাড়িয়ে দেওয়া। ফলে, দেশে বিক্রি আরও কমা, দেশের শিল্পের আরও বেশী বেশী করে বিদেশের বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। এইভাবে, ক্রমশঃ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে, দাঁড়াচ্ছে বিদেশের বাজার, বিদেশের রাষ্ট্র। এতে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপন্ন হবে, জাতির স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।

মধ্যবিত্তের অবাস্তব স্বপ্নকে ভিত্তি করে, উপরের তলার শতকরা ১ ভাগ বড় ব্যবসাদারের স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে, আমাদের পিছিয়ে রাখা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হবে, হচ্ছে, এবং এর সঙ্গে জাতির স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে।

মধ্যবিত্তের অবাস্তব স্বপ্নের, রেফ্রিজারেটর মোটরগাড়ি টেরিলিন কেন্দ্রিক স্বপ্নের, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী রূপটা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

এর পাশাপাশি দুবেলা পেট ভরে মোটা ভাত রুটি খাবার স্বপ্ন। নিজের হাল বলদ নিয়ে নিজের জমিতে চাষ করার স্বপ্ন। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষের স্বপ্ন।

এখানেও ভিয়েৎনামের কথা বলি। ঐ বন্ধুই গল্প করছিলেন। ৩০ বছর আগে যখন হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল—তার একটা প্রথম কাজ হোল চালের দাম বেঁধে দেওয়া। আমাদের পয়সায় এ দাম হোল ৬০ পয়সা কে. জি। ১৯৩০ সালে এখনও ঐ দাম। প্রতিটি মানুষ এখন অন্ততঃ ২০ কে. জি. করে চাল পায় প্রতি মাসে। এটা হোল দৈনিক মাথা পিছু ৬৬৬ গ্রাম। সেখানে পুরুষ স্ত্রী সবাই কাজ করে, কাজ পায়। পরিবার পিছু মাসিক আয় ১২০ থেকে ৪০০ টাকা। অর্থাৎ ৬ জনেরও যদি পরিবার হয়, তবে যে পরিবারের আয় সবচেয়ে কম সেও চালের জন্য ব্যয় করবে মাসে ৬ জন মানুষ×২০ কে. জি.×৬০ পয়সা=৭২ টাকা। অর্থাৎ তার পরিবারের আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ।

এখানে প্রত্যেকটি মানুষ, সবচেয়ে গরীব মানুষও প্রত্যেক দিন অন্তত ৬৬৬ গ্রাম চাল পায়। আর পায় বছরে পাঁচ মিটার করে কাপড়। প্রত্যেকে খেতে পায়, প্রত্যেকে পরতে পায়। যা পায়, প্রত্যেকে পায়।

আমাদের দেশে পরিবারে পরিবারে আয়ের ফারাক অনেক গুণ বেশী। আমাদের কৃষক পরিবারদের অন্ততঃ শতকরা ৪৫% ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। গড়ে এদের ছয় জনের পরিবারে ১½ জন কাজ পায় বছরে ১৮০ দিনের কম, গড় মজুরি দৈনিক ৫ টাকার কম—ফলে ঐ পরিবারের গড় মাসিক আয় প্রায় ১১৩ টাকা। টাকার অংকে ভিয়েৎনামের গরীব পরিবারের প্রায় সমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটো খুব বড় তফাৎ আছে ঃ

১। আমাদের ক্ষেতমজুর পরিবারের আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ দিয়ে চাল কিনলে, তার জন্য পাওয়া যাবে পরিবারের ৬ জনের জন্য মাসে ৬৮ টাকা। এই টাকা দিয়ে আমাদের দেশে চাল কেনা যায় বড় জোর ৩৫।৪০ কে. জি.। কারণ আমাদের দেশে এখন চালের কে. জি. গড়ে অন্ততঃ ২ টাকা। এ দিয়ে দৈনিক মাথাপিছু ২০০।২৫০ গ্রামের বেশী কিছুতেই খাওয়া যায় না। ভিয়েৎনামে এটা ৬৬৬ গ্রাম।

২। আমাদের যারা সবচেয়ে বড়লোক, তাদের আয় অন্ততঃপক্ষে ৪০।৫০ গুণ বা তার থেকেও অনেক বেশী। ভিয়েৎনামে বড়লোকের আয় সবচেয়ে গরীবের তুলনায় বড় জোর ৩।৪ গুণ বেশী। এখানে সবাই খেতে পরতে পায়। ওখানে আমাদের দেশের মত মধ্যবিত্তের দুঃস্বপ্ন নেই। কারণ, ঐ দুঃস্বপ্নকে ব্যবহার করে দেশের শতকরা ১ ভাগ লোকের মুনাফার পাহাড় জমাবার মত কোন ব্যবসাদার ওদেশে নেই। তাই তাদের কোন বিজ্ঞাপনও নেই। কেউ সেই বিজ্ঞাপনের শিকারও তাই হয় না। হওয়ার প্রশ্নই নেই।

আমাদের দেশে প্রশ্ন ওঠে, এখনও ওঠে। এটাকে কি বন্ধ করা যায় না? এটা কি মধ্যবিত্তদের বোঝবার বাইরে যে মধ্যবিত্তের দুঃস্বপ্নের সবচেয়ে বড় ধারক-বাহক গত ক' বছর ধরেই ডুবছে! ক্রমাগত ডুবছে! রাস্তায়, নর্দমায় তাপ্পি দিয়ে, মাটির তলা দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবার নাম করে গর্ত খুঁড়ে কলকাতার এই ডুবে যাওয়াকে থামান যাচ্ছে না। গর্ত খুড়ে এবং বুজিয়ে কোন সহরকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এই সহরকে

বাঁচতে গেলে তাকে উঠে পড়ে খুঁজে বার করতে হবে যে, সে এমন কি তৈরী করতে পারে যার ক্রমবর্ধমান বাজার আছে বা হতে পারে?

এই বাজার খুঁজতে হবে, আমাদের দেশের মানুষদের মধ্যে যে গোষ্ঠী ক্রমবর্ধমান তাদের মধ্যে। এরা হচ্ছে গরীব কৃষক। এরা এদের জমিতে এখন যা উৎপাদন করতে পারে তা দিয়ে এদের সংসার চলে না। এরা যদি বিদ্যুৎ, সেচের জল, সার ঔষধ পায় আর তার সঙ্গে পায় মহাজনের বদলে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা, তবে তার জমিতে ২।৩ গুণ উৎপাদন বাড়বে, তার পরিবারের সব লোক বছরভোর কাজ পাবে। এমন কি এক একর জমির মালিকও দু'বেলা মোটামুটি পেট ভরে ভাত রুটি খেতে পারবে। হয়তো বা মাথাপিছু ৫ মিটার কাপড়ও কিনতে পারবে। এদের যার জমি নেই, যারা আজকের ক্ষেত মজুর বা যাদের জমি এক একরের কম, তাদের প্রত্যেককে অন্ততঃ এক একর করে জমি দেওয়া যায়—যদি কোন পরিবারকে ৫ একরের বেশী জমি রাখতে দেওয়া না হয়। যদি কোনো পরিবারকে মহাজনী করতে দেওয়া না হয়, যদি কাউকে চাল-গম-পাটের ফাটকাবাজি করতে দেওয়া না হয়, যদি যে গরীবেরই ঋণ দরকার উৎপাদনের জন্য, বেঁচে থেকে উৎপাদন বাড়াবার জন্য, সেই ঋণ যদি ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া যায়—তবে দেশের সমস্ত জমির গড় উৎপাদন আজকের তুলনায় অন্ততঃ দ্বিগুণ করা যায়—আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই। এটা করা যায় যদি কলকাতা সহর আর অন্য সহর তার বিদ্যুৎ, শিল্প ব্যবস্থা, কেনা-বেচা করার ব্যবস্থা, ঋণ দানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঢেলে সাজতে পারে দেশের গরীবকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে দেবার ব্যবস্থার যোগান দেবার জন্য। মধ্যবিত্ত তার দুঃস্বপ্নকে কাটিয়ে, মোটরগাড়ি রেফ্রিজারেটর টেরিলিনের মোহকে কাটিয়ে, সকলের জন্য মোটা ভাত—মোটা কাপড় —মাথার উপর ফুটো ছাড়া একটি ছাউনি যোগান দেবার কাজে যদি লেগে যেতে পারে, তবে একটা নতুন ধরনের কলকাতা, একটা নতুন ধরনের মধ্যবিত্ত, একটা নতুন ধরনের জীবনযাত্রা সৃষ্টি করার লড়াই জোর কদমে শুরু হয়ে যেতে পারে। এখনই, আজই।